দু'টি

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

পি. কে. বসু য়্যাণ্ড কোং
কলিকাতা—৩১

—ন'সিকা—

প্রচ্ছদপট-পরিকল্পনা
আশু বন্দ্যোপাধ্যায়

—ঃ০ঃ—

ব্লক ও প্রচ্ছদপট মুদ্রণ
ভারত ফটোটাইপ স্টুডিও

পি, কে, বসু য়্যাণ্ড কোং, কলিকাতা—৩১ হইতে প্রফুল্লকুমার বসু কর্তৃক প্রকাশিত।
৩৭এ, কলেজ রো মিরবহর প্রেস হইতে শ্রীউপেন্দ্রনাথ রায় কর্তৃক মুদ্রিত।

দন্তভিষগাচার্য

ডাঃ বঙ্কিম মুখোপাধ্যায়ের

করকমলে

এই লেখকের :—

মনে ছিল আশা
স্ত্রিয়াশ্চরিত্রম্
ভাড়াটে বাড়ী
রাত্রির তপস্যা
কাছে আছে যারা
প্রভাতসূর্য
প্রেরণা
কমা ও সেমিকোলন
নববধূ
চতুর্দোলা
রাতমোহানা
রজনীগন্ধা
পুরুষ ও রমণী
দুর্ঘটনা
সাবালক
জ্যোতিষী
সীমান্তরেখা
বহুবিচিত্র
স্মরণীয় দিন
স্বর্ণমুকুর
কোলাহল
মিলনান্ত
আব্ছায়া
শ্রেষ্ঠ গল্প
পৃথিবীর ইতিহাস
গল্প সঞ্চয়ন

—প্রথম—

কলঙ্কের ভাগ

তা ফ্ল্যাটটা সতীশ পছন্দ করেছিল ভালই। লেকের কাছে—যদিও কলকাতার সীমারেখার মধ্যে নয়। গ্রামটার নাম গোবিন্দপুর। এর খোয়া-বাঁধানো রাস্তা দিয়ে একটু এগিয়ে এলেই রেল লাইন—তার এপারে লেক। নতুন বাড়ী—তেতলার এ ফ্ল্যাটটা থেকে লেকের জল, দূরে সাদার্ণ আভিন্যুর বাড়ীগুলো, বাস্, সবই দেখা যায়। শনি রবিবারে লেকের পাড়ে যখন পিঁপড়ের সারির মত মানুষের ভীড় জমে ওঠে তখন, এমন কি একটা মৃদু গুঞ্জন পর্যন্ত কানে আসে।

সে দিক্ দিয়ে বলবার কিছুই নেই।

যে আত্মগোপন করতে চায় অথচ একটু স্বাচ্ছন্দ্য, একটু আরামের প্রয়োজন অস্বীকার করতে পারেনা—তার পক্ষে এ একেবারে আদর্শ বাসা। ছোট্ট ফ্ল্যাট, মোট দেড়খানি ঘর, একটুখানি চলন, তারই পাশে অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ রান্নাঘর বাথরুম—তা হোক্, বেশি জায়গার দরকারই বা কি ওর! জীবন ত এই নতুন ক'রে শুরু হ'ল বল্‌তে গেলে, অতীতের কিছুই নেই, কোন-কিছুর জের টানতেও চায়না রমেন। এ ওর পুনর্জন্ম, কোন পরিচিত মানুষেও যেমন দরকার নেই, পরিচিত বস্তুতেও না। ইলেক্‌ট্রিক আছে, আলো—এমন কি ছোট একটা টেবিল ফ্যান্‌ও কিনে রেখেছে সতীশ। বর্তমান সভ্যতা যত কিছু আরামের উপাদান সৃষ্টি করেছে—মোটামুটি তার কোনটারই অভাব নেই এখানে। আর চায় কি সে?

জেল থেকে যেদিন রমেন ছাড়া পায়, সতীশ সেদিন সব ঠিক ক'রে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল ফটকে। চক্‌চকে একখানা নতুন গাড়ীও ছিল একটু দূরে। তাইতে আসতে আসতে পথে সতীশ সগর্বে বলেছিল, 'বলতে পারবে না যে সতীশের ইমাজিনেশ্যন্ নেই। ঠিক যেমনটি দরকার তেমনিটি খুঁজে বার করে রেখেছি। শহরের কোলাহলের বাইরে, অথচ ঠিক নাগালের বাইরে নয়—হাত বাড়ালেই শহর। তোমাকে কেউ দেখতে পাবেনা, তুমি সকলকে চেয়ে দেখবে। ছোট বাসা, বিশ্বাসী চাকর—মডার্ণ কম্‌ফর্টস্ সমস্ত কিছু। স্রেফ কিছুদিন বসে বিশ্রাম করো এবং ইচ্ছেমত লিখে যাও। তোমার সংসারের ভার আমার—তার জন্যে একটুও, মাথা ঘামাতে হবেনা তোমাকে।'

ক্লান্ত রমেন কোনমতে উঠেছিল সিঁড়ি বেয়ে। কিন্তু ফ্ল্যাটে উঠে খুশীই হয়েছিল। নতুন তক্তপোষ, নতুন বিছানা। টেবিল, চেয়ার, ক্যাম্বিশের ডেক চেয়ার একখানা, আন্‌লা, স্যুট্‌কেস্ আরও কত কি, ঝক্‌ঝকে টেবিলের ওপর দামী কাগজের মোটা প্যাড, নতুন ঝরণা কলম, একশিশি মূল্যবান্ কালি। মায় দেওয়ালে একটা ক্যালেণ্ডার, তাকে কয়েকখানা রবীন্দ্রনাথের বই, দু-একখানা ইংরিজি বই—আর তার পাশে চার পাঁচখানা বাংলা বই—সতীশের বই সাজানো। সমস্ত নিখুঁত পরিপাটি।

সতীশের চোখ আছে মানতেই হবে।

রান্নাঘরে নতুন বাসন, ভাঁড়ারের হাঁড়ি কলসি কৌটো পর্যন্ত নতুন। গিয়ে বসতেই চাকর চা করে এনে দিলে, হেঁট হয়ে নমস্কার করে দাঁড়াল। সতীশ বললে, 'ইনিই তোমার মনিব হরিলাল, ভাল ক'রে যত্ন টত্ন করবে।...তোমায় একটা কম্বাইণ্ড-হ্যাণ্ড

ঠিক করে দিলুম রমেন, রান্নাবান্না সব কাজই করতে পারবে। তার বেশি তোমার দরকারই বা কি?'

কিন্তু সেইখানেই বিস্ময়ের শেষ নয়। চাকর চলে গেলে লেখবার নতুন টেবিলটার ড্রয়ার থেকে একটা নতুন চেক-বই আর ব্যাঙ্কের পাশ-বই বার করলে সতীশ। তার সঙ্গে ভাড়ার রসিদ।

'বাড়ীভাড়া তোমার পঁচাত্তর ক'রে—একেবারে তিনমাসের দিয়ে দিয়েছি। একমাস ডিপোজিট থাকবে, অর্থাৎ তিনমাস পরে আবার বাড়ীভাড়া দেবার প্রশ্ন উঠবে। ফার্ণিচার সব কেনা—ভাড়া করা কেউ নয়। সে সব ঝঞ্ঝাট চোকানো আছে। খরচ আমি সব মিটিয়ে দেব মাস মাস—তবু দুচার পয়সা তোমার যা দরকার হবে, আকস্মিক কোন আতান্তরে না পড়ো, এই একটা হিসেবও খুলে রেখেছি। দুশো টাকা জমা আছে, এই চেক্ বই। সেভিংস্ য়্যাকাউন্টে সপ্তাহে একখানার বেশি চেক্ কাটতে পারবে না। তার দরকারই বা কি? মনে আছে ওখান থেকেই একটা ফর্মে সই করিয়ে নিয়েছিলুম? সে এই সারপ্রাইজটি দেব বলেই। তাছাড়া এই টানায় টাকা-কুড়ি-পঁচিশ খুচরোও রইল। সিগারেট একটিন, দেশলাই—ভুল কিছুই হয়নি। বাকী আছে একটা রেডিও—তা তুমি পছন্দ করবে কিনা—'

'না না—কিছু দরকার নেই। এ কী কাণ্ড করেছ সতীশ! কত খরচ করেছ আমার জন্যে!' কৃতজ্ঞতায় চোখে জল এসে গিয়েছিল রমেনের।

'আচ্ছা তবে তুমি বিশ্রাম করো—আমি এখন যাই। আজ সারা দিনে অনেকগুলো এন্‌গেজমেণ্ট আছে। একেবারে কাল সকালে আসব। কেমন?'

'তোমার অফিস আছে ত? না আজ যাবে না?'

'না—অফিস আমি ছেড়ে দিয়েছি।'

'ছেড়ে দিয়েছ? করছ কি তবে?'

'বিজনেস্ নিয়ে আছি, ফিল্ম লাইনে ঘোরাঘুরি করছি একটু।'

সতীশ ব্যস্ত হয়েই চলে গেল।

বিকালের দিকে চাকরকে বালিগঞ্জে পাঠালে রমেন। সব ঠিক জোগাড় করে রেখেছে সতীশ—খালি কিছু মাসিক-পত্র এবং দৈনিক পত্র দরকার। এইগুলোর অভাব সবচেয়ে বেশি অনুভব করেছে ও—এই ক বছরে। জেলে পেত শুধু স্টেটস্‌ম্যান, তাও সব দিন নয়। ওকে সুপারিন্টেণ্ডেন্টের অফিসে কাজ করতে হ'ত, সেখানে মধ্যে মধ্যে পেত ও কাগজখানা। কিন্তু বাংলা কাগজও পড়তে ইচ্ছে করত বৈকি, বিশেষত মাসিকপত্রগুলো—

হরিলালকে ও চার পাঁচখানা কাগজের নাম করে দিয়েছিল। তাছাড়া বলে দিয়েছিল, 'পাঁচটা টাকা দিলুম তোমাকে—এতে যদি কুলোয় ত আরও খানকতক সাপ্তাহিক কাগজ টাগজ নিয়ে এসো, কাগজওলাকে জিগ্যেস ক'রো, যা ভালো বলবে তাই নিও, কেমন?'

তা হরিলাল অনেকগুলোই এনেছিল। মাসিক 'হিন্দুস্থান', 'পরবাসী', 'পৃথিবী'—আর একগাদা সাপ্তাহিক কাগজ, দু'তিনটে বাংলা দৈনিক।

এইবার যেন মনে হচ্ছে ভদ্রসমাজে এসেছে ও। ভদ্রসমাজ—?

কিন্তু সত্যি-সত্যিই কি ভদ্রসমাজে কোনদিন আর ও মিশতে পারবে, চিরদিনের মত সে পথ বন্ধ হয়ে গেল না কি ?

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে রমেন সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিলে—এতদিনের অনভ্যাস, দামী সিগারেটও বিস্বাদ লাগছে।

প্রথমেই একখানা মাসিকপত্র টেনে নিয়ে পাতা ওল্টাতে লাগল। আঃ, কতদিন এই নতুন বই কাগজের গন্ধ পায়নি। পড়বে পরে—আজ এখন শুধু সবগুলো একবার দেখে নেওয়া চাই। বিশেষত এই বইয়ের বিজ্ঞাপনগুলো, সাহিত্যজগতের খবর পাবার এই ত একমাত্র উপায় ! সে যেখানটায় বেশির ভাগ প্রকাশকদের বিজ্ঞাপন, সেইখানটা খুলে দেখতে লাগল আগে।

আরে, এ কী !

'সাধনার অন্তরায়' তৃতীয় সংস্করণ হয়ে গেছে ! কৈ বলেনি ত সতীশ একবারও। সে আবার কবে হ'ল ! ভুল হয়নি ত এদের ? না—এই ত পরিষ্কার লেখা রয়েছে শ্রীসতীশচন্দ্র মজুমদারের যুগান্তকারী উপন্যাস 'সাধনার অন্তরায়'—মূল্য সাড়ে চার টাকা —তৃতীয় সংস্করণ।

তাড়াতাড়ি রমেন 'হিন্দুস্থান'-খানা রেখে 'পরবাসী' তুলে নিলে। সেখানেও এদের বিজ্ঞাপন আছে। ঐ তৃতীয় সংস্করণ ! 'পৃথিবী' খুলে দেখলে তাও তাই। উপরন্তু আরও বিস্ময় জমে ছিল ওর জন্যে। এতে আরও অন্যান্য ফার্ম বিজ্ঞাপন দিয়েছে—এদের কাগজে বিজ্ঞাপন যেন সব চেয়ে বেশি। 'বোধিদ্রুম'—গল্পের বই, দ্বিতীয় সংস্করণ ; 'আয়না'—তাও ত ছোট গল্পের বই—এ কি, তৃতীয় সংস্করণ।...'খোয়া আর মুড়ি' দ্বিতীয় সংস্করণ যন্ত্রস্থ। মোটে

ত ক'মাস আগে বেরিয়েছে বইটা। 'হোমাগ্নি' উপন্যাস চতুর্থ সংস্করণ! হে ঈশ্বর!

কাগজখানা রেখে দিয়ে রমেন যেন স্খলিত পদেই এগিয়ে গেল তাকের দিকে—যেখানে সতীশ মজুমদারের বইগুলো সাজানো ঝক্‌ঝক্ করছে। সবগুলোই নামিয়ে নামিয়ে দেখলে, এ ত সব সেই প্রথম সংস্করণের বই। যা ও জেলখানায় থাকতেই পেয়েছিল।

তবে কি ও চোখে কম দেখছে?

না কি মাথাই গোলমাল হয়েছে ওর? ওর উত্তপ্ত মস্তিষ্ক কল্পনা করছে সবটা?

'হরিলাল!' চাকরকে ডাকলে রমেন।

হরিলাল আসতে প্রশ্ন করলে, 'তুমি বাংলা পড়তে জানো?'

'সামান্য সামান্য জানি বাবু।'

'এইটে কি লেখা আছে পড়ো ত।'

অনেকক্ষণ চেষ্টা করে হরিলাল পড়লে, 'সতীশচন্দ্র মজুমদারের বিখ্যাত উপন্যাস, হোমাগ্নি—চতুর্থ সংস্করণ—সাড়ে তিন টাকা।'

'আচ্ছা, তুমি যাও।' কেমন একরকম স্খলিতকণ্ঠে বলে সে। অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে থাকে হরিলালের দিকে।

প্রাণপণে চেষ্টা করে সহজ, প্রকৃতিস্থ হ'তে। হরিলাল যে ওর অবস্থা দেখে ভয় পাচ্ছে—সেটুকু খেয়াল এখনও আছে ওর।

সে জোর করে একটা সিগারেট ধরায়। কিন্তু এ কী, হাত এত কাঁপছে কেন? তিনটে কাঠি নেভবার পর যখন সেটা ধরে শেষ পর্যন্ত তখন কিন্তু আর রুচি থাকে না—আবার ছুঁড়ে ফেলে দেয়।

থাকগে ওসব কথা। রমেন হাল্‌কা কিছু পড়ার জন্যে সিনেমা সাপ্তাহিক একটা টেনে নেয়। পাঁচ বছর ও সিনেমা দেখেনি—পাঁচ বছরেরও বেশি। শেষ যাওয়া ওর সেই মাধবীর সঙ্গে—

আঃ! মনকে সে শাসন করে, ঐ চিন্তা আবার! জীবন থেকে সে সব ত ওর ধুয়ে মুছে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

আগ্রহ-ভরেই সাপ্তাহিক খানার পাতা ওল্‌টায়, কত নতুন তারকা গজিয়েছে এরই মধ্যে—কত কি ছবি উঠেছে ও উঠ্‌ছে। নবাগতা তারকাদের ছবির দিকে একটু বিস্মিত দৃষ্টিতেই তাকিয়ে থাকে—

এ আবার কি?

চোখ রগড়ে ভাল করে তাকিয়ে দেখে রমেন। আজ কি আর বিস্ময়ের কোন শেষ থাকবে না—মনের মধ্যে অপ্রত্যাশিতের কোন সীমারেখা টানা হবে না কোথাও? একটি তরুণীর ছবির নীচে লেখা রয়েছে, "'সাধনার অন্তরায়' চিত্রে নায়িকার ভূমিকায় শ্রীমতী উজ্জয়িনী দত্ত।" নিচে লেখা—"দিবাস্বপ্ন চিত্র প্রতিষ্ঠানের প্রথম চিত্রার্ঘ সতীশচন্দ্রের বিখ্যাত উপন্যাস অবলম্বনে নির্মিত 'সাধনার অন্তরায়' আগামী মাসেই কলিকাতার বিখ্যাত চিত্রগৃহ-গুলিতে মুক্তিলাভ করিবে।"

কেমন একটা যন্ত্রচালিতের মত বিহ্বল ভাবে রমেন পাতা ওল্‌টায়, ওরও মনে হয় ও স্বপ্ন দেখছে। আক্ষরিক অর্থে এটা ওরই দিবাস্বপ্ন—যদিও গূঢ়ার্থে নয়।

আরও এক জায়গায় নজরে পড়ে, বড় বড় করে সংবাদ দেওয়া হচ্ছে, সতীশচন্দ্রের যুগান্তকারী উপন্যাস 'হোমাগ্নি' যাঁরা তুলছেন, তাঁরা নাকি ইতিমধ্যেই সওয়া দু'লক্ষ টাকা খরচ করেছেন। অর্থব্যয়ে

কোন কার্পণ্যই করা হচ্ছে না—বাংলার শ্রেষ্ঠতম নট-নটীর সহযোগিতায় এই ছবিখানি যে বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রের গৌরব লাভ করবে এ বৎসর—এমন আশা অনায়াসে প্রকাশ করা যায়।

কপালের ঘাম মুছে কিছুক্ষণের জন্য চোখ বুজে বসে থাকে রমেন—সংবাদগুলো হয়ত বা ধারণার মধ্যেই আনবার চেষ্টা করে। কিন্তু কোন কথাটাই স্পষ্ট করে যেন ভাবতে পারে না।

শেষে নিজের ওপরেই বিরক্ত হয়ে বাংলা দৈনিক একখানা তুলে নেয়। অনিচ্ছা সত্ত্বেও চোখ চলে যায় রঙ্গমঞ্চ ও চিত্রের পাতায়। সেখানে আর এক আঘাত অপেক্ষা করেছিল ওর জন্য —"একই সপ্তাহে সতীশচন্দ্রের দুটি কাহিনীর চিত্ররূপ মহরৎ হইতেছে। দেবেন্দ্রপুরী স্টুডিওতে সুধীর মজুমদারের পরিচালনায় 'রূপের স্বর্গ' এবং কৃষ্ণ স্টুডিওতে পরিচালক মেঘেন মিত্রের ব্যবস্থাপনায় 'মর্ত্ত্যের কাহিনী' চিত্রে রূপায়িত হইতে চলিয়াছে। একজন লেখকের দুটি ছোটগল্প অবলম্বনে দুজন পরিচালক ছবি তুলিতেছেন, একই সঙ্গে—ইহা প্রতিষ্ঠাপন্ন হইলেও নবাগত লেখকের পক্ষে কম গৌরবের নহে—" ইত্যাদি।

দুটিই ছোট গল্প—ঠিকই। গল্প দুটোর কথা মনে আছে রমেনের। দুটিই ভাল গল্প। হয়ত কিছুটা ভাবপ্রবণ, তবু গল্প হিসেবে ভাল, তাতে সন্দেহ নেই।

'মর্ত্ত্যের কাহিনী' মহরৎ অনুষ্ঠান হচ্ছে আজই। বেলা চারটেয়।

তাই সতীশের অত কাজ! আজ অনেক এন্‌গেজমেণ্ট!

চাকরী ছেড়ে বিজনেস্ করার অর্থটা জলের মত পরিষ্কার হয়ে যায় রমেনের কাছে। এমন কি ঐ নতুন ঝক্‌ঝকে গাড়ীটাও—। হয়ত ওটা সতীশেরই। কল্পনার অতীত বলে রমেন প্রশ্ন করেনি

গাড়ীটা কার। ধরেই নিয়েছে যে সতীশ ওটা চেয়ে এনেছে কারুর কাছ থেকে।

নির্বোধ সতীশ। ভেবেছিল রমেন জেলের বাইরে এসেও চোখ বুজে থাকবে। ওর চোখে কিছুই পড়বে না।

একটা ম্লান অথচ তিক্ত হাসি ফুটে ওঠে রমেনের মুখে।

অথচ, সব চেয়ে মজা হচ্ছে এই যে—এটা রমেনের স্বখাত সলিল।

কিন্তু কীই বা করবার ছিল। কি করতে পারত সে?

সেদিনের সে অসহায় দিনগুলির কথা ভাবতেও ইচ্ছা করে না, তবু মন চলে যায় সেই সব দিনেই—

হরিলাল এসে আলো জ্বালিয়ে দিতে গেল, রমেন নিষেধ করলে, 'থাক আলো। আমি এখন একটু অন্ধকারেই থাকব। তুমি—তুমি বরং পারো ত এক কাপ চা করে দিও।'

অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে ঘরে; কিন্তু সে কি তার মনের চেয়েও গাঢ়? সেখানে যে আঁধারের দিক-দিশা নেই।

মাধবী।

ঐ একটু আলো। মাধবীর স্মৃতি। সব দুঃখের মূলে মাধবী, মাধবী থেকেই সব অন্ধকার বিচ্ছুরিত হয়েছে—তবু সেই ত আলো।

মাধবীর সঙ্গে পরিচয় হবার আগের দিনগুলো?

কী আনন্দ, কী স্বাধীনতা। শান্তিরও অভাব নেই। দাদা, বৌদি, বাবা। ছোট ছোট ভাইপো ভাইঝি। সুখের সংসার। ব্যাঙ্কে কাজ করত, সামান্য বেতন। শ' দেড়েক টাকা পেত সে। কিন্তু তাতে কোন অসুবিধা হয়নি। কারণ বিয়ে সে করেনি।

সংসারের টাকা দেবার খুব চাপ ছিল না—চল্লিশ, পঞ্চাশ—যে মাসে যা খুশী সে বৌদির হাতে তুলে দিত। সংসার দাদাই চালাতেন —ও টাকার ওপর ভরসা করার খুব বেশি প্রয়োজনও ছিল না তাঁর। বৌদি মাঝে মাঝে তাগাদা দিতেন অবশ্য—'বিয়ে করবে কবে আর? বয়স ত ঢের হ'ল।' তার উত্তরে সে ঐ আয়ের অজুহাতই দিত। 'বিয়ে? তুমি ক্ষেপেছ বৌদি? এই আয়ে বিয়ে? চ্যাঁ ভ্যাঁ—কী খাবো কী খাবো—তখন ছোটরে এর ওপর তিনটে টিউশ্যানী করতে—তাতেও দুঃখের শেষ থাকবে না। মাপ করো রাজা, এই বেশ আছি। দাদার হোটেলে আছি, এর তুল্য সুখ আছে?'

'তা চিরকালই কি এইভাবে কাটবে?'

'ক্ষতি কি? যা কিছু জমিয়ে যাবো সব ত তোমার ছেলে-মেয়েরাই পাবে, এই ভেবে তুমি যত্নই করবে। আর জা আনলেই ত চুলোচুলি, তিনমাস বাদেই পৃথক হবার নোটিস!'

বৌদি হেসে উঠতেন ওর কথা বলার ভঙ্গীতে।

পরিপূর্ণ সুখে দিন কাটছিল বৈকি! ভাল ছবি একটাও বাদ দিত না। গানের আসরে সর্বাগ্রে উপস্থিত হ'ত। ফুটবলের মাঠ ছিল বাঁধা। এমন সময় কোথা থেকে এল মাধবী। মাধবী-লতার মত কোমল অথচ কঠিন—বিচিত্র নারী।

আলাপ?

ওদের অফিসেরই নলিনীবাবুর শ্যালিকা। কিন্তু সে পরিচয় পরে পেয়েছিল। নলিনীবাবু কেশিয়ার, ধনীর পুত্র, একলাখ টাকার সিকিউরিটী দিয়ে সাড়ে তিনশ' টাকার চাকরী করেন। তাও না

করলে চলে। সুতরাং নলিনীবাবুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হবার কথা নয় ওর। ওরা গিয়েছিল ডায়মণ্ড হারবারে পিক্‌নিক্ করতে, বাকী সকলে সে রাত্রির মত রয়ে গেল ডাক বাংলাতে, রমেন একা ফিরল। কারণ বাবার শরীর খারাপ দেখে গিয়েছিল সে, মনে উদ্বেগ ছিল। যাবার সময় বাস্-এ গিয়েছিল বলে আসবার সময় ট্রেনে ফিরল ইচ্ছে করেই। শিয়ালদয় নেমে দেখে গেটের কাছে ছোট একটি জনতা। ব্যাপার কি? ভিড় ঠেলে এগিয়ে এসে দেখলে একটি সুবেশা তরুণী বিপন্নমুখে দাঁড়িয়ে। ফার্স্ট ক্লাসে চেপে আসছিলেন একা, সঙ্গে একটি বছর আষ্টেকের ভাই। হয়ত একটু তন্দ্রা এসেছে—ব্যাগটি রাখা ছিল পাশেই, তার মধ্যে ছিল টিকিট ও টাকা—কখন অন্তর্হিত হয়েছে টের পাননি। এখানে গেটের কাছে পৌঁছে খেয়াল হয়েছে। টিকিট চেকার ছেড়ে দেবেন কিনা ইতস্তত করছেন, বিদ্যুৎবেগে রমেন পকেট থেকে একটা দশ টাকার নোট বার করে দিলে। মহত্ত্বটা কাজে লাগাতে হবে—কৃতজ্ঞতাটা কিছুতেই চেকারকে পেতে দিলে চলবে না। তরুণীর দিকে ফিরে বললে, 'কুণ্ঠিত হবেন না। আমার নাম ঠিকানা দিচ্ছি, কাল কাউকে দিয়ে পাঠিয়ে দেবেন কিম্বা মণিঅর্ডার করবেন। বলেন ত আমিও গিয়ে নিয়ে আসতে পারি। টাকাটার দাবী ছেড়ে দেব তা ভাববেন না।

মেয়েটি হেসে ফেললে, বললে, 'না আপনারই ঠিকানা দিন। আপনি যা যাবেন তা বুঝেছি।'

'আচ্ছা বাজি রাখুন?'

'না, বাজিতে দরকার নেই। মানুষটাকেই যদি না পাই ত বাজি দাবী করব কার কাছে? আপনারই নাম ঠিকানা দিন।'

বৌদির বিদ্রূপকুটিল কটাক্ষ কল্পনা করেই বোধ হয় রমেন অফিসের ঠিকানা দিলে।

পরের দিন হঠাৎ দেখা গেল নলিনীবাবু স্বয়ং হাস্‌তে হাস্‌তে এগিয়ে আসছেন ওর সিটের দিকে, 'ওহে নাইট্‌, কাল তুমি যে Damsel in distress-কে উদ্ধার করেছ, সেটি কে জানো? আমার শ্যালিকা! রায়বাহাদুর প্রমথ দত্তর মেয়ে!'

তাই নাকি!

রমেন অবাক্‌। কাল সারারাত সে ঘুমোতে পারেনি এই ভেবেই যে মেয়েটির পরিচয় পাওয়া গেল না—আর হয়ত কোনদিন পাওয়াও যাবে না। যে-সব কলেজে-পড়া মেয়েদের সে চিরকাল বিদ্রূপ করে এসেছে, সেই ধরণের একটি মেয়ের সপ্রতিভ হাসি যে এমন ক'রে তাকে বিচলিত করবে তা কে জান্‌ত?

চারদিক্‌ থেকে ততক্ষণে রব উঠেছে, 'কী রকম, কী রকম, নলিনীদা—কী ব্যাপার বলুন ত! রমেনের পেটে পেটে এত!'

নলিনীদা সাড়ম্বরে সব গল্পটা খুলে বললেন, তারপর বললেন, 'এই নাও তোমার টাকা আর এই নাও নেমন্তন্ন পত্তর। আমার ওপর হুকুম হয়েছে যেমন করেই হোক্‌ তোমাকে ধরে নিয়ে যেতে হবে।'

দামী নীল চিঠির কাগজে পরিষ্কার মেয়েলি ছাঁদে দুছত্র চিঠি—

'আজ আমার জন্মদিন। আপনার আসা চাই-ই। জামাইবাবুকে বলে দিয়েছি জোর করে ধরে আনতে!'

যা ছিল কাল রাত্রে সুদূর কল্পনার বাইরে, আজ তাই বাস্তব হয়ে ধরা দিয়েছে। শুধু কল্পনা নয়—সত্যিই এ ছিল স্বপ্নের অতীত।

টাকাটা আসবে সে জানত—কিন্তু পরিচয়? না, তেমন দুরাশা ওর ছিলনা।…সহকর্মীদের তামাসা ওকে বেশী বিচলিত করতে পারলে না—যদিও তা অবিশ্রান্তই বর্ষিত হচ্ছিল ওকে লক্ষ্য করে —কারণ বিচলিত সে এমনিই হয়ে পড়েছিল বেশি রকম। শেষে বাধ্য হয়ে গোকুলকে হাতের কাজটা দিয়ে বলতে হ'ল, 'এটা করে দে ভাই—আমার আজ যেন কেমন সব গুলিয়ে যাচ্ছে।'

গোকুল চুপিচুপি বললে, 'কিন্তু ওদিকে বেশিদূর এগিও না দাদা, রায় বাহাদুর প্রমথ দত্ত তোমার সঙ্গে কোনদিনই তার মেয়ের বিয়ে দেবে না!'

'কি বলিস্ যা তা! স্টুপিড তুই একটা। ঐ ভাবনায় ত আমার ঘুম হচ্ছে না।'

সেদিন মাধবী—

অকস্মাৎ চিন্তায় ছেদ পড়ে।

হরিলাল চা এনেছে।

'বাবু চা—?'

চমকে ওঠে রমেন, 'ও চা? আচ্ছা রাখো।' হরিলাল চা রেখে চলে যায়।

মাধবী সেদিন অদ্ভুত সেজেছিল। হাল্‌কা রঙের জর্জেটের সাড়ী, হাতে দু'গাছি মাত্র চুড়ি, খোঁপায় একটা জুঁই ফুলের মালা জড়ানো। কোন প্রসাধন নেই—কোন বেশভূষা নেই। অথচ কী আশ্চর্য দেখাচ্ছিল ওকে। অপূর্ব সুন্দর বললে একটু কম ক'রেই বলা হয়।

নিউ মার্কেট থেকে ফুলের বাস্কেট নিয়েছিল রমেন। সেটা হাতে পেয়ে খুশিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল মাধবী। কিন্তু মুখে একটু অনুযোগই করেছিল, 'ইস্ জন্মদিনের কথাটা না লিখলেই হ'ত। কত খরচ করেছেন বলুন ত! এত ফুল কেন কিনতে গেলেন!' পরক্ষণে নিজেই বলে উঠেছিল, 'বাট্ হাউ লাভ্‌লি!'

সেই সূত্রপাত।

তারপর পরিচয়টা কোথা দিয়ে অন্তরঙ্গ সখ্যে পরিণত হয়েছিল তা রমেনও বোধ হয় জানে না। কিন্তু সেই পর্যায়ে পৌঁছেই যদি থামত!

রমেনের মাথায় বোধ হয় ভূতই চেপেছিল। তা নইলে সে অবনী পালের সঙ্গে যায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে? যে অবনী পালের বাড়ীতে তিনটে আই-সি-এস্। কে না জান্তো যে অবনী পালই প্রমথ দত্তর মনোনীত জামাতা।

মাধবীর দোষ নেই। সে ঠিক জানতো না রমেনের আর্থিক অবস্থাটা। রমেনের বেশভূষা দেখে ত বোঝবার উপায় ছিল না। তাছাড়া সে নিষেধও করেছিল বারবার। এমন কি দু-একবার ওর উপহারের মহার্ঘতা দেখে তিরস্কারও করেছে।

মনে আছে, দু'একবার তার কঠিন ব্যবহারে রমেনই ভয় পেয়ে গিয়েছিল। অকারণ রূঢ়তা ভেবে ম্লান হয়ে উঠত সে-সব সময়। কিন্তু পরেই বুঝতে পারত সে রূঢ়তা, সে কঠিন ব্যবহার ওরই কল্যাণের জন্য, ওকে এই অপব্যয় থেকে প্রতিনিবৃত্ত করার জন্যই। কারণ ওকে আঘাত দিয়ে মাধবীও স্থির থাকতে পারত না। প্রকাশ্যে অপমানিত হয়ে শুষ্ক বিবর্ণ মুখে হয়ত রমেন এক কোণে বসে আছে—সকলের ভীড়ের মধ্যে থেকেও সেটা লক্ষ্য

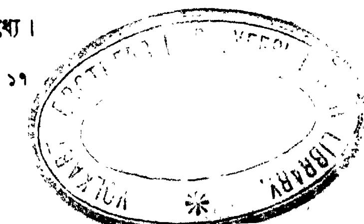
ক'রে মাধবীর চোখ ছল্‌ছলিয়ে উঠত; কোন ছুতোয় আড়ালে ডেকে রমেনের কপালের স্বেদবিন্দু নিজের আঁচল দিয়ে মুছিয়ে দিয়ে গাঢ়স্বরে বলত, 'কেন তুমি অমন পাগলামী করো বলতো! এমন রেকলেস্‌ হয়ে খরচ করতে যাও কেন …সেই জন্যেই ত আমার মাথায় রক্ত চড়ে যায়, যা তা বলি। তুমি আর কখনও এসব করোনা। লক্ষীটি! করবে না ত ?'

কিন্তু রমেন তখন সমস্ত বুদ্ধিবিবেচনার বাইরে। মাধবীর প্রতি ওর আসক্তি তীব্র শ্যাম্পেনের নেশার মত ওকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে—কোন হিতাহিত জ্ঞান থাকা সম্ভব নয় ওর পক্ষে—

তবে উপহারের উপচারের মধ্যে হীরের ব্রেস্‌লেট আর পান্নার নেকলেস্‌ দেখে প্রমথ দত্তর মুখও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল—এটা ঠিক! তিনি ওর আর্থিক ও পারিবারিক তথ্যাদি সংগ্রহ করবেন কিনা একথাও ভাবতে সুরু করেছিলেন। অবনী পাল তা বুঝেই বোধ হয় বিবাহের দিনস্থির করবার জন্য পীড়াপীড়ি করছিল এবং প্রমথ দত্তও ভাল ক'রে চিন্তা করবার জন্য টালবাহানা ক'রে সময় নিচ্ছিলেন। এমন সময় একদিন হঠাৎ রমেন দেখল যে সাত হাজার টাকা ইতিমধ্যেই সে সরিয়েছে ব্যাঙ্ক থেকে। শুধু তাই নয়—যে পদ্ধতিতে ওকে সেটা করতে হয়েছে তাকে জালই বলা উচিত।

মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ল ওর। কোন উপায় নেই—যদি এক ঈশ্বর দয়া করেন!

সেই দৈব অনুগ্রহের আশাতেই গেল রেস খেলতে। প্রথম দিন জিত্‌লও তিনশ' টাকা। পরে কিন্তু ঐ পথেই আরও হাজার ছয়েক বেরিয়ে গেল মাস-খানেকের মধ্যে।



এরই মধ্যে একদিন অডিটারের সতর্ক চক্ষু ব্যাপারটা আবিষ্কার করে ফেললো। চুরি এবং জুচ্চুরি—দুইই।

তারপর ?

তার পরের ইতিহাস খুবই সংক্ষিপ্ত। "শুধু নিম্নে ঘোর বেগে আকর্ষণ নিদারুণ নিপাতের।"

টাকা থাকলেও লড়া চলত কিনা সন্দেহ। তবু ওর সহকর্মী এই সতীশ অনেক চেষ্টা করেছিল, কিছু টাকাও তুলেছিল নাকি। কিন্তু ওর বাবা আর দাদা এক পয়সাও দিতে রাজী হননি। বাবা বলেছিলেন, 'অপরাধ যখন করেছে তখন শাস্তিটা ভোগ করাই ভাল। প্রায়শ্চিত্ত হয় ওতে।' সতীশটা বোকা, সে প্রমথ দত্তর কাছেও গিয়েছিল, তিনি প্রায় দূর দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন, 'ওর সঙ্গে যে আমাদের পরিচয় আছে এটাও আমি স্বীকার করবনা—a common thief and a swindler—ওর জন্যে আবার মকদ্দমা।'

কিন্তু সতীশ হাল ছাড়েনি; টাকাও বেশ খানিকটা খরচ করেছে সে। রমেনের মনে হয়—হয়ত ওর ভাবতে ভাল লাগে বলেই যে—সে টাকা মাধবীই দিয়েছে সতীশকে।

কিন্তু স্রোতের মুখে কুটির বাধা কতক্ষণ ?

ছ' বছরের সশ্রম কারাদণ্ড। মোটে ছ'বছর ? আরও বেশি আশা করেছিল রমেন।

চা-টা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। আঃ—আকণ্ঠ শুষ্ক হয়ে গেল যে তৃষ্ণায়! জ্বালা আজও কিছুমাত্র কমেনি।

মাধবী বিয়ে করেছে অবনী পালকে। সতীশ নামটা প্রথমে করেনি, তবে অনুমান করতে পারে রমেন অনায়াসেই। কীই বা করতে পারত বেচারী? প্রমথ দত্তকে ত চেনে রমেন! মাধবীর কথা শোন্‌বার মত লোক তিনি নন্।···আর মাধবীই বা কি আশায় বসে থাকবে ওর জন্যে। কেন থাক্‌বে? ওর মত মানুষের সম্বন্ধে প্রেম বা শ্রদ্ধা কি থাকা সম্ভব?

রমেনের বাবা এ লজ্জা এবং অপমানের আঘাত সইতে পারেন নি। তিনমাসের মধ্যেই মারা গিয়েছিলেন। দাদা বহু চেষ্টা করে আসামে বদলি হয়ে গিয়েছেন, যেখানে বাঙ্গালী নেই, লজ্জা যেখানে প্রতিনিয়ত তাঁকে ক্ষতবিক্ষত করবে না, যেখানে পরিচয় দিতে তাঁর ছেলেদের মাথা হেঁট হবে না।

সংবাদগুলো আসে জেলের ভিতরে একের পর একে।

সেই সমস্ত প্রকার আশা-শূন্য অন্ধকার দিনগুলিতে আর কোন অবলম্বন ছিল না যখন—তখন এই নেশাটাকেই সর্বশক্তি প্রয়োগে জড়িয়ে ধরলে সে। মানে, সাহিত্যের নেশা! সৃষ্টির নেশা।

য়্যাকাউণ্টস্-এর কাজ জানত বলে তার সৌভাগ্য ক্রমে সুপারিন্টেণ্ডেন্টের অফিসেই কাজ পেয়েছিল—কেরাণীগিরির কাজ। ভাল কাজ ও বাধ্যতার পুরস্কার-স্বরূপ সাহেব খুশি হয়ে ওকে নিজস্ব ব্যবহারের জন্য একটি কলম, কালী ও কিছু কাগজ দিলেন।

ছেলেবেলায় স্কুল ম্যাগাজিনে লিখ্‌ত—তা ছাড়া পড়েছে বিস্তর। সেই অভিজ্ঞতাই কাজে লাগে। কয়েকবার কাগজ নষ্ট করার পর একটা গল্প দানা বেঁধে যায়, ওর মনে হয় মন্দ হয়নি।

লেখাটা কোন কাগজে দেবে নাকি? একবার পাঠিয়ে দেখতে দোষ কি?

কিন্তু কার নামে দেবে? এই ঘৃণিত, নিন্দিত নাম? ছি! অপর কোন নামে দেওয়াই উচিত।

প্রথমেই মনে পড়ে গেল সতীশের নাম, তাছাড়া ওর হাত দিয়ে দেওয়াই সুবিধা—জেলখানার ছাপ দেখলে কি কোন কাগজ ছাপবে?

সতীশ আসত মধ্যে মধ্যে দেখা করতে। তাকে প্রস্তাবটা করতে সে ত হেসেই খুন।

'যাঃ। আমার নামে দিবি কি? তারপর যদি ছেপে দেয়, সবাইয়ের কাছে সাহিত্যিক বলে পরিচিত হবো, ওধারে মুরোদ নেই নিজের এক কলমও লেখবার। কি ফল্‌স্‌ পোজিসানে পড়ব বল্‌ত।'

'তাতে কি হয়েছে। ছাপবে যে সে আশা খুবই কম। আর তুই ত সেকালে কবিতা লিখতিস্‌—'

জোর করেই সতীশের নাম ঠিকানা লিখে সে ওর হাতে দিয়েছিল—'ডাকে পাঠিয়ে দিস্‌।'

এতদিনে অদৃষ্টদেবতা বোধহয় ওর দিকে মুখ তুলে চাইলেন। কিংবা আরও খানিক বিদ্রূপ করলেন।

যা কদাচিৎ কারোর ভাগ্যে ঘ'টে সেই অঘটনই ঘটল। প্রথম লেখাটিই ওর ছাপা হয়ে গেল—এবং এক বিখ্যাত মাসিকে।

সেই কাগজ থেকে ছাপা পৃষ্ঠা ক-খানা কেটে নিয়ে সতীশ এল দেখা করতে।

আরও তিন চারটে গল্প ওর হাতে দিয়ে দিলে রমেন। একটা ফেরৎ এসেছিল, বাকী সব ছাপা হয়ে গেল। ক্রমে আরও

কতকগুলো। রমেন এই অবলম্বন পেয়ে বাঁচল—পাগলের মত লিখে যেতে লাগল। তখন ও স্বপ্নেও ভাবেনি যে এ থেকে সতীশ টাকা পাচ্ছে।

একদিন সতীশ নিজেই বললে, 'দু পাঁচটা টাকাও পাচ্ছি রে মধ্যে মধ্যে!'

'ও তুই-ই রেখে দে। তোরও ত ছুটোছুটি কম হচ্ছে না।'

সতীশ কখনও গোটা কাগজ আনত না। ওর লেখা ছাপা সেই ক-টা পৃষ্ঠা।

তা হোক্। তার বেশি সেদিন দরকারও ছিল না। ছাপা হচ্ছে—এই-ই যথেষ্ট।

গল্প উপন্যাস—যেন বন্যার জলের মত বেরিয়ে আসতে লাগল ওর কলম দিয়ে।

অবশেষে একদিন সতীশের মুখে শুনলে—পুস্তাকাকারেও বেরোচ্ছে ওর গল্প বা উপন্যাস। সতীশ বললে, 'এক প্রকাশক বাগানো গেছে। সে রাজী হয়েছে ছাপ্তে।...কিছু টাকাও পাবি রে—বেরিয়ে একেবারে অগাধ জলে পড়তে হবে না। এ টাকা আমি তোর জন্যেই তুলে রাখব।'

'যা হয় কর্ ভাই—ভবিষ্যতের ভাবনা আমি বহুকাল ছেড়ে দিয়েছি।'

তবু সেদিনও কি একটা আঘাত—বরং তাকে একটা বেদনা বলাই উচিত—পায়নি ও?

কাগজে বেরোয় সতীশের নামে, সে আলাদা কথা—কিন্তু বই! চিরস্থায়ী ভাবে সতীশের নামের সঙ্গে জড়িত হয়ে রইল। রমেনের নাম কোন দিনই কোন পাঠক জানবে না, অনুমান পর্যন্ত করতে পারবে না।

পরক্ষণেই মনকে শাসন করেছিল। এমন নাম নয় যে সেটা প্রচার করতে হবে। কলঙ্কিত নাম—চিরদিন এই নামের সঙ্গে ছাপ থাকবে ওর দুষ্কৃতির। তাছাড়া অনেক করেছে ওর জন্য সতীশ। এটুকু অন্তত সে পাক্ এই উপকারের বদলে।—

কিন্তু তাই ব'লে এতখানি প্রতিষ্ঠা!

অস্থির হয়ে উঠে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে লাগল রমেন।

অন্ধকার ঘর। দূর লেক থেকে বিজলী বাতির একটা ক্ষীণ আভা মাত্র এসে পড়েছে। কোলাহলের রেশ আসছে--অসংখ্য কণ্ঠের মিলিত গুঞ্জন, শব্দসমষ্টির অর্থহীন পরিণতি একটা—

এই আলোর আভাটুকুও বোধহয় ওর জীবনে আর অবশিষ্ট নেই।...

'বাবুর শরীর কি খারাপ লাগছে? চা খাবেন একটু?'

'চা?' অকস্মাৎ অধীর আগ্রহে যেন অস্থির হয়ে ওঠে রমেন, 'চা একটু আন্‌ত বাবা, খুব গরম আর খুব কড়া।'

চা খেয়ে আলো জ্বেলে লিখতে বসল রমেন। আর যে বঞ্চনা করে করুক—ওর প্রতিভা, ওর সৃজনী-শক্তি ত আজও ওকে ত্যাগ করেনি! সে শক্তির অগ্নিপরীক্ষা হবে আজ। মনের এই বিচলিত অবস্থাতেও মস্তিষ্ক তার কাজ করে যেতে পারে কিনা দেখবে রমেন।...নতুন প্যাডে নতুন কলম দিয়ে ঝর্ ঝর্ করে লিখে চলল গভীর রাত পর্যন্ত। লিখল ওর সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করেই। নিচে সই করল—এই প্রথম, সতীশ মজুমদার নয়, নিজের নাম।

তারপর প্রায় কিছু না খেয়েই বিছানায় এলিয়ে দিলে নিজেকে। শান্তিতে ও শ্রান্তিতে চোখের পাতা বুজে এল।

পরের দিন সতীশ সকালে এল আরও বহু জিনিস এবং এক বাক্স সন্দেশ নিয়ে। বিগত রাত্রির জ্বালা তখন কমে গেছে রমেনের। তবু একটু অনুযোগ করলে—কিন্তু তাতে তীব্রতা আর ছিল না।

সতীশ কিন্তু বেশ সপ্রতিভ। সে বললে, 'ভাই এ মুকুট ত আমি চাইনি, তুমি নিজেই পরিয়েছ। রাজ-মুকুট পরতে গেলে কিছু আড়ম্বর চাই বৈ কি! জানো ত সরকার মহামহোপাধ্যায় উপাধি দেন যখন তখন একটা বৃত্তিরও ব্যবস্থা করে দেন। এত বড় পণ্ডিতকে না ভিক্ষা করতে হয়, উপাধি দেবার আগে সেটাও বিবেচনা করেন।'

রমেন বললে, 'কিন্তু তুমি আমাকে এ কথাগুলো গোপন করলে কেন?'

'বললে কি সুখ পেতে তুমি? কষ্টই পেতে না কি খানিকটা? যেমন পেয়েছ কাল?…কী করবে ভাই, এ তোমার স্বখাত সলিল। কিন্তু তোমাকে ত আমি একেবারে ঠকাইনি—এটাকে পার্টনারশিপ বিজনেস্ ধরলেই পারো। তুমি তোমার ভাগ নিয়ে খুশী থাকো—'

রমেন আর কথা বাড়ালে না। অনেক কথাই বলা চলত। বলা চলত যে পার্টনারশিপ ব্যবসায়ে একটা হিসেবের কথা থাকে। বলা চলত যে মূলধন যার—সেই বেশি পায়। সতীশ পার্টনার

হলেও ওআর্কিং পার্টনার—তার বেশি নয়। কিন্তু এসব কথা বলতে আর প্রবৃত্তি হ'ল না। একটা কথা সতীশ বলেছে ঠিকই—এ ওর স্বখাত সলিল। সতীশ ত চায়নি, ও-ই জোর করে চাপিয়েছে তার ঘাড়ে—

সতীশ বলছিল, 'পোজিশ্যন্ রাখতে রাখতেই দিন গেল। আজ সভা, কাল সমিতি—এখানে সভাপতি, ওখানে প্রধান অতিথি। গাড়ী কিন্‌তে হয়েছে অনেক দুঃখেই। খরচা কি কম?'

তারপর প্যাড্‌টার দিকে তাকিয়ে বললে, 'কাল লিখলে নাকি কিছু?'

'না, সে ছিঁড়ে ফেলেছি।' এই প্রথম রমেন ওর কাছে মিথ্যে কথা বললে।

গল্পটা 'পরবাসী' থেকে ফেরৎ এল দিন-সাতেক পরেই। সঙ্গে একটি ছাপা লেবেল। রমেনের মনে হ'ল যে ওরা পড়েও দেখেনি। স্ট্যাম্প দেওয়া ছিল বলে সঙ্গে সঙ্গে ফেরৎ দিয়েছে।

সব চেয়ে মজা এই যে ঐ সংখ্যার পরবাসীতে প্রথমেই ছাপা হয়েছে সতীশ মজুমদারের একটি গল্প—

'হিন্দুস্থান' থেকেও ফেরৎ এল। 'পৃথিবী' ফেরৎও দিলে না, ছাপালেও না।

প্রথমটা তত জ্বালা বোধ করেনি, যতটা এখন করলে।

কয়েকদিন কোন কাজে মন বসল না। বই পড়ে—অর্থ বোধগম্য হয় না। রাত্রে ঘুমোতেও পারে না ভাল ক'রে।

অবশেষে স্থির করলে যে ও নিজেই একদিন যাবে 'পরবাসী' অফিসে। ওকে কে চেনে? ব্যাঙ্কের কেরাণী রমেনের সঙ্গে সাহিত্য জগতে বিচরণকারী কারুরই কোন দিন আলাপ পরিচয় ছিল না।

এতকাল পরে ও প্রথম কলকাতার রাস্তায় পা দিলে। প্রথম ট্রামে চড়ল। ওর ভয় ছিল যে পথে কোন পরিচিত লোকের সঙ্গে না দেখা হয়ে যায়। অবশ্য সেটা দুপুর—সে সম্ভাবনা কম।

'পরবাসী' অফিসে গিয়ে শুনলে যে সম্পাদকের সঙ্গে দেখা হওয়া সম্ভব নয়। যে-কোন এক সহকারী সম্পাদকের সঙ্গে আগে দেখা করতে হবে—তাঁরা প্রয়োজন বুঝলে তবে সম্পাদকের কাছে পাঠাবেন।

গেল এক সহকারী সম্পাদকের কাছে,, তিনি তাচ্ছিল্যভরে চোখ তুলে তাকালেন। বললেন, 'ও, লেখা এনেছেন? রেখে যান!' আবার কাজে মন দিলেন।

দু-কান জ্বালা করছিল রমেনের তবু কোন মতে বলে ফেলল, 'দেখুন একটা অনুরোধ ছিল।'

'বলুন।' কাজ করতে করতেই তিনি বললেন।

'আপনাদের কে গল্প নির্বাচন করেন, যদি তাঁর একটু দেখা পেতুম—একটা পৃষ্ঠা একটু শোনাতে চাই।'

স্পষ্ট বিদ্রূপের হাসিতে মুখ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে তাঁর, 'আপনার বিশ্বাস সেইটুকু শুনেই মুগ্ধ হয়ে তিনি তখনই আপনাকে সাহিত্য-সম্রাট্ খেতাব দিয়ে দেবেন?'

অসহ ক্রোধে রমেনের ইচ্ছা করছিল ওর এই হাসি চিরকালের মত অবলুপ্ত ক'রে দেয়, তবু সে প্রাণপণে আত্মসম্বরণ ক'রে বললে, 'একেবারে তা অসম্ভবই বা ভাবছেন কেন?'

'আপনি এর আগে কোন কাগজে লিখেছেন?' তিনি প্রশ্ন করেন।

'আমার নিজের নামে লিখিনি।'

'কি নামে লেখেন তবে?'

'সেটা বলতে পারব না। বাধা আছে।' একটু ইতস্তত ক'রে উত্তর দেয় রমেন।

'দেখুন—এখানে যে সব নবীন লেখক আসেন তাঁদের সকলেরই প্রায় এই মনোভাব যে, কোনমতে তাঁদের লেখাটা শোনাতে পারলেই আমরা মোহিত হয়ে যাব—শুধু পড়ে দেখিনা বলেই তাঁদের লেখা ফেরত যায়। কিন্তু আমাদের পক্ষে তখনই তখনই প্রত্যেক লেখকের লেখা পড়ে দেখা ত সম্ভব নয়। আমাদের একটা নিয়ম করে রাখতে হয়, সেটা ভাঙবারও কোন কারণ দেখছি না, আপাততঃ। আপনার ইচ্ছা হয় ত লেখা রেখে যান—নয় ত সঙ্গে নিয়ে ফিরে যান। এখন শোনা কারুর পক্ষে সম্ভব হবে না।'

তবু লেখা রেখে এল রমেন। এবার ফেরৎ এল তিন দিনের মধ্যে।

ইতিমধ্যে প্রথম যে লেখা পরবাসী ফেরৎ দিয়েছিল সেটা সতীশ মজুমদারের নামে সগৌরবে প্রথম পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হয়ে বেরিয়ে গেল—'পরবাসী' কাগজেই।

অদৃষ্টের পরিহাস। অনেকক্ষণ ধরে হাসল রমেন একা একাই।

কিন্তু সে হাসি কি অন্তরের তিক্ততার পাত্র উপ্‌চেই বার হয়নি?

৬

একটা উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি নিয়ে রমেন কয়েকটি প্রকাশকের কাছেও ঘুরে এল।

কেউই পাণ্ডুলিপি রাখতে চাইলেন না। একজন সদুপদেশ দিলেন, 'আপনার বই যতই ভাল হোক—আমরা ত ছাপতে পারব না। আপনার নাম কৈ? চেষ্টা করুন কোন ভাল কাগজে আগে বার করতে। নামটার প্রচার হোক, তখন আপনিই চাহিদা হবে।'

একজন দিলেন কাগজের দুষ্প্রাপ্যতার অজুহাত।

আর একজন স্পষ্ট করে কিছু না বলে ভদ্রভাবে বললেন, 'আপাতত একটু অসুবিধা আছে আমাদের।'

এর ঠিক আগের উপন্যাসখানাকে উপলক্ষ করে সতীশ মজুমদারকে কয়েকটি বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান অভিনন্দন জানালেন। সে সব সভার বিবরণ কাগজে ছাপা হল সাড়ম্বরে। মানপত্র দেওয়া হ'ল। একটি অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করলেন, স্বয়ং তারাশঙ্কর। আর একটিতে সজনীকান্ত দাস। প্রবোধকুমার সান্যাল নাকি অযাচিতভাবে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপক চিঠি পাঠিয়েছেন। অতুল গুপ্ত করেছেন সমালোচনা।

রমেন রাত্রে ঘুমোতে পারে না আজ কাল কোন দিনই। বাংলা খবরের কাগজ পড়া বন্ধ রাখে। অথচ তাতেও একটা অস্বস্তি বোধ করতে থাকে—আবার কাগজ কিনে আনতে লোক পাঠায়। যাতে বেদনা বোধ করে সেই সংবাদই খোঁজে ও সর্বাগ্রে। ওর স্রষ্টার মন এ পূজায়, এ অভিনন্দনে একটা উগ্র মাদকতার সন্ধান পায়। এ প্রশংসা যেন সুরার মত দহন করে, আবার সুরার মতই মাতিয়ে তোলে ওর প্রতিভাকে।

প্রতিমা ত খড়ের পুতুল—পূজা কি ও-ই পাচ্ছে না পরোক্ষভাবে?

একদিন সতীশকে বললে, 'ছাখো ভাই জীবন-মৃত্যুর কথা কিছু বলা যায় না। তা ছাড়া মতিও যে তোমার এই রকম

থাকবে চিরকাল তার ঠিক কি।...ঐ বইয়ের কপিরাইটগুলো আমাকে লিখে দাও।'

'সবগুলো? সর্বনাশ। তাই কখনও হয়। আমি দাঁড়াবো কোথায়?...তবে হ্যাঁ খান দু-তিন বই না হয় লিখে দিচ্ছি। বন্ধুত্বের নিদর্শন স্বরূপ—সেটাতে কেউ এমন কিছু অবাকও হবে না। তা ছাড়া তোমার ভাবনা কি, তোমার আসল মূলধন, তোমার মাথা ত রইলই। তখন আর একটা নামে লিখবে!'

রমেন সে প্রচেষ্টার ফলাফলের কথা না জানিয়েই বললে, 'কিন্তু ক্ষমতা ত ক্রমে কমে আসবে!'

সতীশ দুটি গল্পের বই আর দুটি উপন্যাসের কপিরাইট যথারীতি ষ্ট্যাম্প কাগজে হস্তান্তর-নামা লিখে দিলে একদিন, 'ব্যস্—আর কিছু বলো না। এখন চট্ করে অমনি জোরালো একটা বই লিখে দাও দিকি। 'নিমপাতা'র মত।'

রমেন বললে, 'ঐ নিমপাতাটা আমাকে লিখে দাও।'

'পাগল! ছেলেপুলে খাবে কি? আমি বরং তোমার য়্যাকাউণ্টে ও থেকে হাজার খানেক টাকা জমা করে দেব। বলো ত একটা লাইফ ইন্‌সিওর করিয়ে দিই—'

রমেন অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বললে, 'থাক্।'

সতীশ তাগাদা দিচ্ছে, গল্প চাই কয়েকটা—পূজা আসছে। গত তিন মাসে এক লাইনও লেখেনি রমেন। আর কখনও লিখবে না ভেবেছিল। কিন্তু ক্রমে সে প্রতিজ্ঞা ভাঙতে হয়।

না লিখলে চল্‌বে কিসে? অন্য কোন কাজ? কী কাজ করবে, কে কাজ দেবে ওকে? তা ছাড়া—সৃষ্টির নেশাও ওকে স্থির থাক্‌তে দেয় না শেষ পর্যন্ত।

অনেকদিন পরে বুকের নিঃশ্বাস চেপে আবার লিখতে বসে। কোন এক বিখ্যাত দৈনিকের জন্য বড় গল্প একটি লিখতে হবে। একশ টাকার গল্প।

কদিন ধরেই লিখছে, লিখতে লিখতেই একদিন নজরে পড়ল শিলংয়ের একটি খবর। অধ্যাপিকা মাধবী দত্তের উদ্যোগে এখানে একটি সাহিত্য সম্মেলনের আয়োজন চলছে—সভাপতিত্ব করবেন সতীশ মজুমদার।

মাধবী দত্ত?

অধ্যাপিকা মাধবী দত্ত?

কিন্তু সতীশ ত বলেছিল তার বিয়ে হয়ে গেছে। তার ত আর দত্ত পদবী থাকার কথা নয়।

এ নিশ্চয় অন্য কোন মাধবী দত্ত।

কাগজ-খানা সরিয়ে রেখে আবার কলম টেনে নেয় রমেন। কিন্তু লেখায় যেন আর মন বসে না। এতকাল পরে মাধবীর নামটা যেন ওর মনের মর্মমূলকে পর্যন্ত নাড়া দিয়ে গেছে। বর্ষার সময় হঠাৎ একটা পূবের জানালা খুলে গেলে যেমন হু হু করে বাতাস আর জল ঢোকে—তেমনি করেই স্মৃতি আর তিক্ততা ওর মনের অন্ধকার-করে-রাখা প্রত্যন্ত ভাগে প্রবেশ করে। কত কি তুচ্ছাতিতুচ্ছ ঘটনা, মাধবীর একটু হাসি, এক টুকরো বিদ্রূপ; ছোটখাটো মান-অভিমান! তার সঙ্গে ওর কারা-জীবনের সেই ভয়ঙ্কর দিনগুলি। প্রথম প্রথম যখন থাকতে না পেরে অন্ধকারে

উঠে এসে দরজার গরাদে ধরে ডাকত আপন মনেই পাগলের মত—'মাধবী! মাধবী!' সেই সব স্মৃতি কেমন যেন একাকার হয়ে গেছে মনের মধ্যে—

তাই কলম যে কখন স্বপ্নাবিষ্টের মত লিখে চলেছে তা ও টেরও পায়নি :—

"লতিকার একটা হাত ধরে রজত বললে, 'আজ ইচ্ছে করছে তোমার একটা নামকরণ করি!'

'কেন বলো ত!'

'এমন একটা নাম তোমার রাখব, যে নামে আমি ছাড়া আর কেউ কোন দিন তোমাকে ডাকবে না। ডাকতে পারবে না—কারণ জানবে না।'

'বেশ ত রাখ না। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় গুরুদত্ত বীজমন্ত্রের মত যা শুধু থাকবে তোমার মুখে আর আমার কানে?' হেসে বলে লতিকা।

'কী নামে ডাকব বলো ত!' রজত প্রশ্ন করে।

'তাও কি তোমাকে বলে দিতে হবে। কোন্ নামে আমাকে ডাকলে তোমার ভাল লাগবে তা আমি কি জানি?'

'হ্যাঁ ঠিক! আমি তোমাকে ডাকব চামেলি বলে। চামেলি ফুলই আমার সব চেয়ে প্রিয়।'

'আর আমি? আমি কিন্তু তোমাকে নাম দেব না কিছু।'

'তবে কি বলে ডাকবে?'

লতিকা আগুনের মত রাঙ্গা হয়ে ওঠে। ধীরে ধীরে মুখটা নামিয়ে আনে ওর কানের কাছে। তারপর বলে আস্তে আস্তে, 'যে সম্বোধনে আর কাউকে কোন দিন ডাকিনি—এবং ডাকবও

না—যে ডাক শুধু তোমার জন্যেই আছে। তবে তা চামেলির মত অত রোমান্টিক নয়—অথচ তা চিরন্তন, চিরকালীন নাম—ওগো!'

তারপর ওর কানের ওপর ঠোঁট দুটো প্রায় চেপে ধরে বলে, 'ওগো, ওগো শুনছ!'

অসহ সুখে রজতের সারা দেহ কাঁপতে থাকে থর থর করে।"

কিন্তু রমেনের ঘাম দেখা দেয় কেন ললাটে, ওর বুকের স্পন্দন এত বাড়ে কেন? কলম কেন কিছুতেই স্থির থাকেনা হাতে?

এ কী!

আরে! এ কী করেছে সে। এসব কি লিখে বসে আছে? ছি ছি!

ছিঁড়ে ফেলতে গিয়েও আবার থেমে যায় রমেন। কী হয়েছে, ক্ষতিই বা কি? পৃথিবীর লোক ত জানবে নিতান্তই কোন এক কল্পিত রজত এবং লতিকার প্রণয়-নাট্যের বিবরণ।

থাক্।

একটা কোথাও লিপিবদ্ধ হয়ে থাক্ এই কথাগুলো।

রমেন উঠে খানিকটা পায়চারী করে। এক কাপ চা খায়—অবার ফিরে এসে লিখতে বসে।

মাধবী দত্ত কিছুতেই সম্মেলনটা পূজোর আগে করতে পারলে না। আগামী চৈত্রমাসের আগে করা সম্ভব হবে না। চাঁদা উঠল না যথেষ্ট, এদিকেও বাধা ঢের।

মনটা ওর খিঁচড়ে রইল। মা চিঠি লিখেছেন কলকাতায় যাবার জন্য কিন্তু কলকাতায় ও যাবেনা এটা ঠিক। কলকাতা

থেকে পালিয়ে থাকবে বলেই সে এখানে এসেছে। নইলে চাকরী করার ত কোন্ দরকার ছিলনা ওর।

নির্জন দিনগুলি যেন কাটতে চায় না এই প্রবাসে। এখানে মেশবার মত যা দু-একজন ছিলেন, তাঁরা সবাই চলে গেছেন। ও সাগ্রহে বসে থাকে পূজা সংখ্যার কাগজগুলির জন্যে।

অবশেষে অনেকগুলো শারদীয়া কাগজ এসে পৌঁছয় একদিন। সবচেয়ে মোটা এবং ভাল কাগজখানাই মাধবী তুলে নেয়। একটা দুটো লেখার পর চোখে পড়ে সতীশ মজুমদারের দীর্ঘ কাহিনী 'তিক্ততা'।

হিটারের দিকে পা তুলে দিয়ে জমিয়ে বসে মাধবী পড়তে থাকে।

কিন্তু একি! ওর বুকের স্পন্দন থেমে যাবে নাকি? এ কী হচ্ছে ওর বুকের মধ্যে!

এ—এ কার লেখা? এসব কথা সতীশ মজুমদার জানবে কি করে? কেমন করে?

এ ত সামান্য রজত আর লতিকার কথা নয়—এ যে ওর বুকের মধ্যেই ক্ষোদাই করা এক অবিস্মরণীয় ইতিহাস!

এ যে মাধবী আর রমেনের কথা। ঠিক তেমনি—যেমনটি ঘটেছিল।

তবে কি সতীশকে বলেছিল রমেনই, কোন এক দুর্বল মুহূর্তে বলে ফেলেছিল?

না, রমেনের পক্ষে তা সম্ভব নয়। এটুকু সে রমেনকে চেনে।

মাধবী সেই দিনই রওনা হয় কলকাতার দিকে।

সতীশ মজুমদারের ঠিকানা ত সে জানতই—ট্রেন থেকে নেমে কোন মতে বাক্স বিছানাগুলো নামিয়ে রেখে ট্যাক্সীতেই চলে গেল তার বাড়ী।

সতীশ একটু অবাক হ'লেও হাসি হাসি মুখে সাদর অভ্যর্থনার জন্য উঠে দাঁড়াল তাড়াতাড়ি। কিন্তু মাধবী সৌজন্যের দিক্ দিয়েই গেল না। ঘরে ঢুকেই প্রশ্ন করলে, 'সতীশবাবু—এসব লেখা কার বলুন ত!'

কণ্ঠস্বর কঠিন অথচ শান্ত—দ্বিধার অবকাশ নেই তার মধ্যে।

এ বজ্র যেমন আকস্মিক, তেমনি অপ্রত্যাশিত। দীর্ঘদিনের অভ্যাসে মিথ্যা যখন ক্রমশ নিজের মনেও প্রায় সত্য হয়ে উঠতে চলেছে—তখন এ কী রূঢ় আঘাত?

'তা-তার মানে?'

'তার মানে আপনার লেখা এগুলো নয়। অপরের লেখা আপনি চালান নিজের নামে।'

'এ কথার অর্থ? কে বলেছে এসব কথা। আমি আজ থেকে লিখছি না। অপরের লেখা দু-একটা চালানো যায়, এতদিন ধরে এত বই চালানো যায় না।'

'আপনি লিখুন ত আমার সামনে।'

সতীশ চটে ওঠে, 'আপনার সামনে আমাকে পরীক্ষা দিতে হবে নাকি? কে আপনি! কোন্ সাহসে এমন কথা বলেন আমাকে?'

'দেখুন সতীশবাবু, সাহসের প্রশ্নটা আপাতত থাক! আপনি আমাকে ভাল করেই চেনেন। আমি জানি এ আপনার বন্ধু রমেনবাবুর লেখা। যদি আপনি সহজে স্বীকার না করেন তাহলে

আমি এমন একটা রাও তুলে দেব যে ভদ্রসমাজে আর মুখ দেখাতে পারবেন না।'

সতীশ খানিকটা গুম্‌ খেয়ে বসে থেকে বললে, 'এসবে আপনার লাভ কি, আপনি কেন অস্থির হচ্চেন!'

মাধবী বললে, 'আগে আপনি স্বীকার করুন।'

মুখটা গোঁজ করে সতীশ উত্তর দিলে, 'তা আমার দোষ কি, সেই ত স্বেচ্ছায় আমার নামে লিখেছে। এখন আমাকে সে অভিনয় করে যেতেই হবে।'

রুদ্ধনিশ্বাসে মাধবী প্রশ্ন করে, 'তিনি—মানে আপনার বন্ধু এখন কোথায়?'

ওর বুকের স্পন্দন যেন থেমে আসে মুহূর্তের জন্য।

সতীশ জানলার দিকে মুখ ফিরিয়ে বললে, 'বলতে নিষেধ আছে। আমাকে দিয়ে দিব্যি গালিয়ে নিয়েছে—কাউকে যেন না বলি।'

'আমাকে বলতেও নিষেধ আছে?'

'বিশেষ করে আপনাকেই বলা বারণ।'

'ও···আচ্ছা। তিনি কলকাতায় আছেন কিনা এটুকুও বলতে পারবেন না।'

'কলকাতায় সে নেই।' সতীশ মাটির দিকে তাকিয়ে নিরাসক্ত কণ্ঠে বলে।

চুপ করে বসে থাকে দুজনেই কিছুকাল। শুধু বড় ঘড়িটার একটা একটানা শব্দ হতে থাকে।

কিন্তু খানিক পরে মাধবীই সোজা হয়ে বসে,—'আপনাকে একটা কাজ করতে হবে। দু-একটা লেখা ওঁর নামে প্রকাশ করতে হবে।'

'সে—সে কেমন করে হবে। না না, তাতে আমার অপমানের শেষ থাকবে না।'

'কেন, আপনার অপমান কিসে? অন্য কেউ লিখতে পারে না?'

'না—পারে। তবে তা তারা ছাপাবে কেন? আর তার যখন নিষেধ আছে—'

'নিষেধ আছে কিনা জানি না। কিন্তু আজ যদি আপনি কোন কাগজকে বলেন যে আপনিই অন্য নামে দু-একটা লেখা লিখতে চান ত তাদের কোন আপত্তিই হবে না। এই ত খামের ওপর দেখছি 'আমার দেশ' লেখা—নিশ্চয় 'আমার দেশ' কাগজে পাঠাচ্ছেন, এদেরই চিঠি লিখে দিন না। আমি নিজে গিয়ে ওদের অফিসে পৌঁছে দিচ্ছি।'

'না। সে আমি পারব না। এ সবের অর্থ কি? এ কী ব্ল্যাকমেল না কি?' সতীশ রাগ করে বলে।

'হ্যাঁ, তাই।...আপনি যদি এ ব্যবস্থা না করেন তাহলে আমি সমস্ত কাগজের অফিসে ঘুরে ঘুরে একথা বলে আসব। আমার পরিচয় পাবার পর সহজে কেউ একথা অবিশ্বাসও করবে না এটা মনে রাখবেন।'

মাধবীর কণ্ঠে নিঃসংশয় দৃঢ়তা। এ কণ্ঠস্বরের সঙ্গে কিছু পরিচয় আছে সতীশের।

অত্যন্ত অনিচ্ছাতে সতীশকে খামখানা ছিঁড়তে হয়। ভেতরের লেখাটা অতি পরিচিত, সেদিকে চেয়ে মাধবীর বুকটা যেন লাফিয়ে বেরিয়ে আসতে চায় অন্তরের অবরোধ থেকে।

সতীশের লেখা চিঠি এবং গল্প নিয়ে মাধবী নিজেই চলে যায় 'আমার দেশ' অফিসে।

রমেন অন্যমনস্ক ভাবেই 'আমার দেশ'এর পাতা উল্‌টোচ্ছিল। অকস্মাৎ নিজের নামটা দেখে চমকে উঠল। আরও চমকে উঠল গল্পটায় চোখ বুলিয়ে। এ যে সত্যি-সত্যিই ওর লেখা।

হরিলালকে একটা স্লিপ দিয়ে পাঠালে সতীশের কাছে—'এ কী কাণ্ড?'

লিখে উত্তর দেয় না সতীশ, নিজেই এল খানিক পরে, স্মিত প্রফুল্ল মুখে বললে, 'না, আমি ভেবে দেখলুম তোমার নামেও দু-একটা বেরোন ভাল। যদি আমি আজ মরেই যাই!'

'কিন্তু—'

'না না, ভয় পাবার কিছু নেই। কে আর সেই রমেন চ্যাটার্জির সঙ্গে এই রমেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের যোগাযোগ খুঁজে বার করছে, তুমিও যেমন!'

মোটের উপর সতীশ লোক খারাপ নয়। খুশি হয়ে ওঠে রমেন।

'ব'সো ব'সো। চা খাও। হরিলাল—চা করো ত বাবা। খুব তাড়াতাড়ি।' আতিথেয়তায় আজ আন্তরিকতাই প্রকাশ পায়!

চায়ের ফাঁকে ফাঁকে চলে টুক্‌রো টুক্‌রো গল্প।

আজ সকাল থেকে বড় বেশি মনে পড়ছে মাধবীকে। ক'দিন ধরেই—। কাজেই প্রশ্নটা একসময়ে বেরিয়ে পড়ে—'আচ্ছা, অবনী পাল এখন কোথায়?'

সতীশ এমন করে চমকে ওঠে কেন? ভূত দেখার মত?

'তা ত জানি না। কেন বল ত?'

'না এমনি। ওর সঙ্গেই ত মাধবীর বিয়ে হয়েছিল, না?'

'হ্যাঁ। অন্তত আমি ত তাই শুনেছি। মাসখানেকের মধ্যেই ওর বাপ বিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছে।' কণ্ঠস্বরে অস্বাভাবিক জোর দেয় সতীশ।

'শুনেছ মানে।...তোমাকে নেমন্তন্ন করেনি।'

'রামোচন্দ্র!'

'তবে যে শুনেছিলুম—মানে—আমার মামলার টাকাটা নাকি ও-ই দিয়েছিল, মানে মাধবী।'

'ক্ষেপেছ! তোমার জন্যে ত তার ঘুম হচ্ছে না।' কণ্ঠে বিষ সতীশের।

অনেকদিনের অস্পষ্ট ধারণা বিশ্বাসে রূপান্তরিত হয়েছিল। অন্তর তাই থেকেই মধু আহরণ করত একান্ত তৃষ্ণার সময়। আজ সেই শেষ অবলম্বনটুকুও খসে পড়ায় আঘাত পায় রমেন। কিন্তু তবু সারাদিনই মাধবীর চিন্তা ওকে আচ্ছন্ন করে রাখে। শেষে সন্ধ্যাবেলা বেরিয়ে পড়ে ও আলিপুরের দিকে। আলিপুরেই অবনী পালের বাড়ী। অবনী পাল যদি কলকাতায় থাকে ত বাড়ীতেই থাকবে নিশ্চয়। মাধবীকে একবার দূর থেকেও দেখে আসতে পারবে। সেদিনের সেই ক-টি ছত্র লেখবার সময় লেখকের মনেও এক তীব্র অথচ ভুলে যাওয়া পিপাসা জাগিয়ে তুলেছে। পিপাসাতে সমস্ত অন্তর ওর শুষ্ক হয়ে উঠেছে যেন।

আটটা নাগাৎ খুঁজে খুঁয়ে গিয়ে হাজির হয়, 'পাল প্রাসাদে' —সৌভাগ্যক্রমে বেশিক্ষণ দাঁড়াতে হ'ল না। একটুখানি ইতস্ততঃ করেছে মাত্র, বাইরে থেকে একখানা গাড়ী এসে ঢুকল। গাড়ীর আলোকিত অভ্যন্তরে অবনী পালের পাশে অত্যন্ত বেশি রকমের পেন্ট্ করা একটি স্ত্রীলোক বসে—সর্বাঙ্গে গহনা।

বাগানের বাঁকে গাড়ী অদৃশ্য হতে দারোয়ান যখন ফাটক বন্ধ করছে রমেন এগিয়ে গিয়ে প্রশ্ন করলে, 'আচ্ছা ঐ যে বাবু গেলেন উনিই কি বড়বাবু।'

'নেহি ত। উ তো আছে ছোটবাবু আর ছোটমা।'

'মানে ছোটবাবুর আউরৎ!'

'হাঁ হাঁ। ত ফিন্ আউর কোন্ হোবে ছোট মা!'

অনেকক্ষণ পথের মধ্যেই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল রমেন। এ কি হ'ল! কোথায় যেন একটা কি বড় রকমের গোলমাল হয়ে গেছে।

তবে কি সতীশ ভুল শুনেছে।...না কি—?

অনেকক্ষণ পরে স্খলিত মন্থর গতিতে আবার বাড়ীর দিকে রওনা হয় রমেন।

কী কারণে তা হয়ত রমেনও জানে না—সতীশকে কথাটা বলতে পারলে না সে। শুধু নতুন যেন একটা কী আশা—অকারণ এবং অস্পষ্ট—মনের মধ্যে গুঞ্জরিত হয়ে ওঠে। মনে হয়--কেন কে জানে—বুঝি সমস্ত একেবারে নষ্ট হয়নি।

আরও একটা ছুটো গল্প বেরোয় রমেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের।

তারপর রমেন নিজেই এখান থেকে ডাকে দেয়—অবশ্য কেয়ার অফ সতীশ মজুমদার ঠিকানা দিয়েই—সাপ্তাহিক 'আমার দেশ'এ তা ছাপাও হয়ে যায়।

সতীশের ভ্রূকুটি করাল মূর্তি ধারণ করে তার ফলে। দিনে-রাতে তার ঘুম হয় না আজকাল। আহারে রুচি চলে যায়।

আজকাল রমেন একটু একটু বাইরেও যায়। সন্ধ্যার আবছায়া গাঢ় হয়ে এলে লেকের ধারে গিয়ে বসে। লাইনের দিকটা, সেখানে বড় বড় আমগাছে একটা অন্তরাল সৃষ্টি করে রেখেছে স্বাভাবিক ভাবেই—সেখানে গিয়ে যতটা সম্ভব ছায়াতেই বসে। শুধু নির্জনতার খাতিরেই নয়—শুধু আত্মগোপনের জন্যও নয়—এখানকার প্রতি তৃণ-কণা—এক সুমধুর অবিস্মরণীয় স্মৃতি বহন করে ওর মনের মধ্যে।

কিন্তু তবু একদিন মণীশের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। দৈবের যোগাযোগ, নইলে অকস্মাৎ মণীশ এসে ঠিক্ ওর পাশেই বা বসে পড়বে কেন—আর তৎক্ষণাৎ দেশলাই বা জ্বালবে কেন?

'আরে, রমেন!'

'এই ত!' অগত্যা বলতে হয় ওকেও।

তারপর। কিছুক্ষণ দুজনেই চুপচাপ। কি কথা বলা যায়, কী প্রসঙ্গ পাড়া উচিত তা ঠিক করতে পারে না মণীশ। শেষ পর্যন্ত যে কথাটা এড়াতে চায় সে, সেইটেই যেন বেরিয়ে যায়, 'কবে এলি?'

'মাস ছয়েক।' সহজভাবেই বলে রমেন।

'আছিস কোথায়?'

'এই ত কাছেই।'—আবার কিছুক্ষণ নিস্তব্ধতা।

'ও, তাই মাধবী দত্তকে দেখছি ক-দিন কলকাতায়!'

'কেন? ওকি আজকাল কলকাতায় থাকে না?' অনিচ্ছাতেও প্রশ্নটা বেরিয়ে যায় রমেনের মুখ দিয়ে।

'তার মানে? তুই জানিস না?'

'না। আমি ত শুনেছি তার বিয়ে হয়ে গেছে কদিন পরেই —মানে সেই সময়—'

হঠাৎ থেমে যায় রমেন।

'সে কি রে! তোদের প্রেম যে তখন টক্ অফ দি টাউন হয়ে উঠেছিল। মাধবী বিয়ে করবে? তুই ত আচ্ছা পাগল! তা-ই যদি করবে তাহলে তোর মকদ্দমার জন্যে গয়না বেচে রাশি রাশি টাকা ধরে দেয় ঐ সতীশটাকে?'

একসঙ্গে কি একশটা অর্কেস্ট্রা বেজে ওঠে কোথাও? অকস্মাৎ শূন্যে লাফ দেবার ইচ্ছা হয় কেন? আচ্ছা ঐ লেকের জলটায় ঝাঁপিয়ে পড়ে যদি সাঁতার কাটা যায় খানিকটা—।

কোন্ দূর থেকে যেন মণীশ বলছে, 'বিয়ে!...ওর বাবা অবিশ্যি ধরপাকড় করেছিল কিন্তু মাধবী শেষ পর্যন্ত সোজা হোস্টেলে গিয়ে উঠতে সে প্রসঙ্গ ঐখানেই শেষ হয়। এম-এ পাশ করতে ত সামান্যই দেরী ছিল—টিউশানী ক'রে সেই ক-মাসের খরচা চালায়। তারপর কোথায় একটা চাকরী নিয়ে চলে যায়—আসামের দিকে।...তুই কি সত্যিই কিছু জানতিস্ না?'

'না।' আস্তে আস্তে বলে রমেন। যেন বহুদূর থেকে ভেসে আসে ওর নিজেরই কণ্ঠস্বর।

'স্ট্রেঞ্জ!' নিভে যাওয়া সিগারেটটা আবার ধরায় মণীশ।

অনেকক্ষণ পরে কথা বলার শক্তি খুঁজে পায় রমেন, 'তাকে—তাকে কোথায় দেখলি ?'

'দুদিন দেখেছি এর ভেতর। কথা হয়নি। সে আমাকে চেনেও না। একদিন ডালহাউসি স্কোয়ারেই দেখা, উল্টো দিকের ট্রামে বসে ছিল সে।...আর একদিন বড়বাজারের মুখটাতে 'আমার দেশ' অফিস থেকে বেরোচ্ছে—'

'আমার দেশ ?'

'হ্যাঁ—ঐ যে সাপ্তাহিক একখানা কাগজ আছে না ?'

'তুই ওখানে কেন গিয়েছিলি ?'

'আমি ? ও—ইনসিওরেন্সের কেস্ ছিল একটা।'

'আমার দেশ'! 'আমার দেশ' কাগজেই ত সতীশ প্রথম ওর নামে গল্প দেয় !

তবে কি, তবে কি এর ভেতরও মাধবীর একটা যোগাযোগ আছে ?

আরও দু একটা কথার পর মণীশ বিদায় নেয়। ওর ঠিকানাটার জন্য পীড়াপীড়ি করে, রমেন বলে, 'দেব ঠিকানা দু-একদিন পরে, বাড়ী বদলাব কিনা শিগগির্ই !'

রাত্রে সতীশ এসে দেখলে অন্ধকার ছাদে পায়চারী করছে রমেন।

কাষ্ঠহাসি হেসে বললে, 'ব্যাপার কি হে !'

'না, এমনি। অন্ধকারটা বড় ভাল লাগছে।' তারপর হঠাৎ সামনে এসে বললে, 'মাধবীর সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছিল এর ভেতর? সত্যি ক'রে বল সতীশ!'

'মাধবী—কৈ না ত?'

'কিন্তু শুনেছি সে কলকাতায় এসেছে।'

'কার মুখে শুনেছ? কে বলেছে এ কথা? মিছে কথা বলেছে!' কেমন যেন উত্তেজিত হয়ে ওঠে সতীশ।

'শুনেছি কারুর মুখে। মিছে কথা নয়। তুমি হয় ত জানোনা।'

'আমি জানব না মাধবী দত্ত কলকাতায় এলে।'

'মাধবী দত্ত! পাল বলো।...তা ছাড়া কলকাতায় আসাটা অত অসম্ভবই বা কিসে? অবনী পাল ত ছ মাস হ'ল কলকাতায় বদলী হয়েছে। তার ত কলকাতাতেই থাকবার কথা।'

যেন প্রচণ্ড একটা ধাক্কা খায় সতীশ।

'এত কথা কে বললে?'

'যে-ই বলুক, জানি আমি।'

সতীশ খানিকটা চুপ করে বসে থেকে উঠে যায়। ওর যেন পায়ের নিচে থেকে মাটি সরে যাচ্ছে! আর চুপ করে থাকলে চলবে না। ক্রমশঃ হিংস্র হয়ে ওঠে ও।

আক্রমণটা এল কয়েকদিন পরেই। সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবে।

হঠাৎ রমেনের এই ঠিকানায় একটা চোতা সাপ্তাহিক কাগজের এক প্যাকেট এসে হাজির। এ কাগজ কে পাঠালে? কে জানে এ ঠিকানা?

কাগজ খুলে দেখলে এক বেনামী প্রবন্ধে উদীয়মান লেখক রমেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের শ্রাদ্ধ করা হয়েছে। সে চোর, সে জেলখাটা দাগী আসামী, এমন লোককে সাহিত্যিক সমাজে স্থান দেওয়া কিছুতেই উচিত নয়! কোন কাগজেরও উচিত নয় এই লেখকের লেখা ছাপা। এসব লোককে সর্বতোভাবে সমাজে বর্জন করাই উচিত—ইত্যাদি, ইত্যাদি।

রমেনের হাতটা কাঁপতে লাগল থর্ থর্ করে—যে হাতে সে কাগজখানা ধরেছিল! এই ভয়ই ওর ছিল, এই জন্যেই সে নিজের নামে কখনও লেখেনি। যদি কখনও সাহিত্যিক খ্যাতি হয়, সভাসমিতিতে যেতে হবে, সাধারণের সামনে দাঁড়াতে হবে, এ সে জানে। ছেলেবেলায় তারাই বহু সাহিত্যিককে ডেকে এনে সভার আয়োজন করেছে। যে সম্মান যে পূজা তাঁরা পান তা যে-কোন মানুষের পক্ষেই কাম্য—কিন্তু সেই যশের বেলুন কোন দিন যদি এই রকম কোন অতীত ইতিহাসের খোঁচায় ফুটো হয়ে যায় ত সে লজ্জা রাখবে কোথায়?

কিন্তু এ ত সে জানত!

তাই নিজের লেখা স্বেচ্ছায় সে অপরের নামে প্রকাশ করেছে। যশ ও অর্থ সব থেকেই বঞ্চিত হয়েছে। তবে এ তার অদৃষ্টে কেন ঘটল! কেন ঘটল!

কে এ কাজ করলে!

যে করেছে সে এখানের ঠিকানা জানে। তা নইলে কাগজখানা এল কি করে।

সে লেখা পাঠায়—সেও ত সতীশের ঠিকানায়।

তবে কি সতীশই—?

রমেনের যেন বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয়না কথাটা—

একটু পরে সতীশই আসে হাঁপাতে হাঁপাতে, 'ওহে দেখেছ, তোমার মাধবী দত্তের কাণ্ড?'

বুকটা ধড়াস্ করে ওঠে রমেনের, 'না, কি?'

'মুড়োঝাঁটা কাগজখানা দেখো নি?'

'দেখেছি। কিন্তু তার সঙ্গে ওর কি সম্পর্ক?

'বিলক্ষণ! গিয়েছিলুম যে ওদের আফিসে। কাগজখানা পড়ে সর্বাঙ্গ জ্বলে গেল আমার। অনেক কথাই শুনলুম কিনা—জেরার মুখে সব কিছুই বেরিয়ে গেল। মাধবীর বিয়ে হয়নি অবনী পালের সঙ্গে, আমি ভুলই শুনেছিলুম। তোমাকে উপলক্ষ করে শেষ পর্যন্ত বিয়ে ভেঙ্গে যায়। সেই রাগ ওর। সেই রাগেই এই সব কাণ্ড করে বেড়াচ্ছে। আমি অবিশ্যি ও কাগজের মালিককে আচ্ছা ক'রে কড়কে দিয়ে এসেছি। কিন্তু মাধবীর এই কাণ্ড! ছি ছি!'

রমেন চুপ করেই থাকে। শুধু ওর মনের অবস্থাটা প্রকাশ পায় ওর রগের ফুলে ওঠা দুটো শিরায় এবং সেই শীতের দিনেও ফুটে-ওঠা অজস্র স্বেদ-বিন্দুতে—

সতীশ বললে, সহানুভূতির স্বরেই বললে, 'তুই বরং এক কাজ কর, রমেন—বাইরে কোথাও চলে যা দিন কতকের জন্যে। হাজারীবাগ রোডে বিভূতি দত্তের বাড়ী আছে, যেতে চাস ত যা—টাকাকড়ির জন্যে ভাবিসনি। কিংবা আরও নির্জনে থাকতে

চাস্ ত দিঘায় যা, ওখানে ডাক-বাংলো আছে, সমুদ্রতীরে দিনকতক বেশ কাটবে।...এ গ্লানিটা কেটে যাক্।'

আস্তে আস্তে বলে রমেন স্বপ্নাবিষ্টের মতন—'তাই যাবো সতীশ। একেবারেই সরে যাবো তোদের জীবন থেকে—আর নয়। এ টানাটানি আর ভাল লাগছে না।'

সতীশ শিউরে ওঠে। বোধহয় নিজের ভবিষ্যৎ চিন্তা করেই। এ আবার কি কথা? আক্রমণের সময় এ দিকটা ত সে ভাবেনি। কাছে এসে কাঁধে হাত দিয়ে বলে, 'ওসব মতলব ছাড়্। কী হয়েছে—কে বা তোকে জানছে, কে বা চিনছে। কে-ই বা মনে রাখছে। তোর ব্যক্তির সঙ্গে নামটার দূরত্ব ত কম নয়।'

'কিন্তু নামটাকেই যে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলুম সতীশ। আমি ত গেছিই—নামটাও যদি থাকত। সে নামের সঙ্গে এ কলঙ্ক যে লেগে রইল চিরকালের মত।'

'কিছু না। কিছু না। তুই দিন-কতক কোথাও চলে যা দিকি। তা হলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। তুই তৈরী হয়ে নে। হরি বরং সঙ্গে যাক্। এ বাসা আগ্‌লাবার ভার আমার।'

রমেন উত্তর দিলে না। সতীশ একেবারে শ-দুই টাকা পকেট থেকে বার করে ওর টেবিলের ওপর রেখে পিঠে চাপড় মেরে বললে, 'অত ভাবিস্ নি। অত ভাববার কিছু নেই।'

সতীশ চলে যাবার পর পাথরের মূর্তির মত বসে রইল রমেন। সারাদিন এবং সারারাত। খাবার ঠাণ্ডা হয়ে শুকিয়ে

অধ্যায়ে পরিণত হল। হরিলাল তাগাদা দিতে এসে কোন সাড়াই পেল না। রমেন শুধু সারাদিনে কাপ তিনেক চা খেলে ওর কাছ থেকে চেয়ে।

পরের দিন ভোরে রমেন সেই পাজামা-পরা অবস্থাতেই উদ্‌ভ্রান্তের মত বেরিয়ে পড়ল।

কাল বহু রাত্রি পর্যন্ত ভেবে মন সে স্থির করেছে। জীবন শেষ করবে সে ঠিকই! যৌবনের এই মধ্যাহ্ন-কালেই নিজে হাতে স্বেচ্ছায় এই জীবনের ওপর সে মৃত্যুমলিন যবনিকা টেনে দেবে। সব সাধ গেছে। একটা ছিল, নামটাকে সে ওর কলঙ্কিত ইতিহাসের ঊর্ধ্বে কোথাও প্রতিষ্ঠিত করে রেখে যাবে —তাও ত পূর্ণ হল না। তবে কেন সে আর মিছিমিছি দেহের বোঝাটাকে বইবার জন্য এত কাণ্ড করবে। ভূতের বেগার দিয়ে যাবে একমুষ্টি অন্নের জন্য।

কী বা লাভ!

কিন্তু যাবার আগে সে একবার মাধবীকে দেখতে চায়। তার মৃত্যুরূপা প্রিয়াকে।

কাছে থেকে না হোক—দূর থেকে।

সতীশের কথা সে বিশ্বাসও করেনি কিন্তু অবিশ্বাস করবার মত মনের জোরই বা কোথায়? যদি সত্যিই মাধবী তাকে ভালবাসত তাহলে কি সে অপেক্ষা করত না জেলখানার দোরে! চিঠি লিখত না একখানা?

মাধবী অপরাধী মনে করেছে নিজেকে? তাই সরে গেছে ওর চোখের বাইরে—মনের বাইরে?

না, এতটা বিবেচনা আশা করেনা সে—

এই মেয়েদের সে চেনে।

শুধু দূর থেকেই সে দেখবে—একবার। বহুদিন দেখেনি। বহু বিনিদ্র রাত্রির বাসনা পূর্ণ করবে।

তারপর ?

গঙ্গায় জল ত আছে। ঠাণ্ডা, মধুর। সকল জ্বালার শেষ।

সতীশ রমেনের ওখান থেকে বেরিয়ে সোজা গিয়েছিল মাধবীদের বাড়ী।

'এ কী কাণ্ড হ'ল শুনেছেন?'

মাধবীর কাছেও ডাকযোগে এসেছিল বৈকি 'মুড়ো ঝাঁটা' এক কপি! কাগজখানা হাতে নিয়ে সেও স্তম্ভিত হয়ে বসেছিল। যদি এ কাগজ রমেনের চোখে পড়ে থাকে, তার মনের কী নিদারুণ অবস্থাই না হয়েছে। রমেনের মুখের বেদনাবিবর্ণ পাণ্ডুরতা, তার অব্যক্ত যন্ত্রণা কল্পনা করে বার বার শিউরে উঠছিল মাধবী।

যদি কোনমতে ঠিকানাটা পেত সে। যদি তার পাশে গিয়ে দাঁড়াতে পারত এই অবস্থায়। ওর নিজের বেদনা দিয়ে ধুয়ে মুছে নিত রমেনের সমস্ত দুঃখ, সমস্ত বেদনা—

সতীশের কথায় সে চমকে উঠল, 'না কি হ'ল? কার কি হ'ল সতীশবাবু!'

'এই যে—আপনার কাছেও এসেছে দেখছি 'মুড়ো ঝাঁটা' কাগজ। কে এ কাজ করলে তাই ভাবছি। আমার কাছে ডাকে পাঠিয়েছে একখানা কাগজ। পড়েই ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটেছি রমেনের কাছে, তাকে জানাতে—! কিন্তু গিয়ে দেখি যা ভেবেছি তাই, আমি যাবার আগেই

তার চোখে পড়েছে। কাউকে কিছু না বলে এক কাপড়ে কোথায় চলে গেছে। এমনি কি ঘড়ি-কলমও নিয়ে যায় নি। আমি, আমি ভাবছি কি জানেন—হয়ত বা সে আত্মহত্যা করতেই গেছে। যদি তাই হয়? কোথায় যে খুঁজব তাকে তাও ত ভেবে পাচ্ছি না।'

মাধবী বিশ্বাস করবে না ওর কথা, কিছুতেই না। তবু কি হৃদ্‌পিণ্ড ওর বন্ধ হয়ে যাচ্ছে?

প্রাণপণ চেষ্টায় সে সামলে নেয় নিজেকে। শান্ত. কঠিন দৃষ্টি সতীশের মুখের ওপর মেলে সে সহজ ক'রেই বলে, 'এত বড় বন্ধুর কাছ থেকে এমন আঘাত পেলে হঠাৎ কিছু করে বসা আশ্চর্যও নয়।'

সতীশ ঢোঁক গিলে বলে, 'তার মানে?'

'মানে লেখাটা যে কার তা আমিই যখন পড়ামাত্র বুঝতে পারলুম তিনি কি আর পারেন নি।...'

'লেখাটা কা-কার বলছেন।' ঢোঁক গিলে গিলে প্রশ্ন করে সতীশ।

আরও কঠিন হয়ে ওঠে মাধবীর কণ্ঠস্বর, 'আপনার আর কার। কালিদাস যে ডালে বসেছিলেন সেই ডাল কাটতে গিয়েছিলেন। ঈর্ষ্যায় অন্ধ হয়ে আপনিও সেই মুর্খতাই প্রকাশ করেছেন। সত্যিই যদি ভাল-মন্দ তাঁর কিছু হয় ত লেখক সতীশ মজুমদারের কী দুর্গতি হবে তা ভেবে দেখেছেন কি।'

'আপনি—আপনি কি বলচেন আমি ত কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'আপনি এখান থেকে বেরিয়ে যান সতীশবাবু, আর কোন দিন কোন ছুতোয় আমার সামনে আসবেন না! চলে যান্—'

অসহ্য ক্রোধে মাধবীর শিরাগুলো ফুলে ওঠে। চোখ দুটো হয়ে ওঠে লাল। সতীশ এক-পা এক-পা করে পিছিয়ে আসে ভয়ে।

মাধবীর সমস্ত দিনটা কাটল অবর্ণনীয় যন্ত্রণায়। যে কান্না সে কাঁদতে পারল না—সেই রোদনে ওর চোখ দুটি ক্রমশঃ রক্তবর্ণ হয়ে উঠ্‌ল। সতীশের কথা সবই মিথ্যা—তবু, তবু যদি সত্যিই হয়? কী করবে, কেমন করে এর প্রতিকার করবে। সে যে ঠিকানাটাও জানে না ওর—

অবশেষে দুপুরের পর মাধবী বেরিয়ে পড়ল বাড়ী থেকে অস্নাত, অভুক্ত অবস্থায়। আসল কথাটা সে ভোলেনি। আজ বৃহস্পতিবার, 'আমার দেশ' ছাপা আজই শেষ হবে—

তার আগে তাকে একটা চিঠি দিতেই হবে।

সম্পাদকের কাছে গিয়ে সব খুলে বলে মাধবী। হাত জোড় করে তার কাছে, 'দোহাই আপনার, এই বিবৃতিটুকু ছাপুন আপনি। এত বড় খবর ছাপ্‌লে আপনার কাগজের ক্ষতি হবে না বরং লাভই হবে।'

'কিন্তু'—তিনি তবু ইতস্ততঃ করেন, 'যদি সতীশবাবু মানহানির মামলা করেন?'

'আমার নাম ঠিকানা সব দিচ্ছি। তাছাড়া আপনারাই ত সাক্ষী—সতীশ মজুমদার আর রমেন চ্যাটার্জীর হাতের লেখা দুই-ই এক। নয় ত এক কাজ করুন, বিজ্ঞাপন হিসাবে ছাপুন আমার বিবৃতি—আমি সমস্ত খরচ দিচ্ছি—'

সম্পাদক অবশেষে রাজী হন।

মাধবী তার বিবৃতিতে কিছুই গোপন করে না। সে-ই যে রমেনের অধঃপতনের কারণ তা স্বীকার করে, এবং তার সঙ্গে এমন খোঁচা রাখে যাতে এটা বোঝা যায় যে টাকাটা ভাঙ্গার চক্রান্তের মধ্যে সেও ছিল। মাধবী কথা দিয়েছিল টাকাটা সে পূরণ করে দেবে কিন্তু তা পারেনি। মাধবীরই কোন গোপন দুষ্কৃতি ঢাকবার জন্য প্রয়োজন হয়েছিল টাকাটা। তারপর সতীশের বেনামীতে গল্প লেখার ইতিহাস বিস্তারিত ভাবে বলে সে জনসাধারণকে জানাবার দায়িত্ব গ্রহণ করে যে সতীশ মজুমদার আসলে শিখণ্ডী, গাণ্ডীবী স্বয়ং রমেনই।

বাড়ী ফিরে এসেও মাধবী নিশ্চিন্ত হতে পারে না। সমস্ত সন্ধ্যাটা সে ঘুরে বেড়ায় গঙ্গার ঘাটে ঘাটে, স্টেশনে। সারারাত ঘরে পায়চারী করে সে।

হে ঈশ্বর, ওকে বাঁচিয়ে রাখ শুধু।...

অবশেষে ভোরবেলা মনে হয় তার উত্তপ্ত মস্তিষ্ক জেগেই স্বপ্ন দেখছে—নইলে রমেনের গলার স্বর সে শুনতে পাবে কেমন করে, 'মাধবী, মানে—তোমার দিদিমণি বাড়ী আছেন যদু?'

'হ্যাঁ বাবু। আপনি ভাল আছেন ত? ডেকে দেব তাঁকে?'

স্বপ্নই।

তবু তর্ তর্ করে নেমে আসে মাধবী। আর স্বপ্ন নয়। রমেনই দাঁড়িয়ে। ওর উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি, উন্মাদের মত বেশভূষা দেখে সেও যেমন বুঝতে পারে রমেনের বেদনার ইতিহাস, তেমনি রাত্রিজাগরণ-ক্লিষ্ট মুখ দেখে রমেনেরও বুঝতে বাকী থাকেনা মাধবীর অন্তরের কথা—

সহজকণ্ঠে মাধবী বলে, 'এসো। তোমারই প্রতীক্ষা করছি।'

রমেন কেমন একরকম অসহায় ভাবে কান্নাভরা সুরে বলে—'আর আসব না মাধবী। সব শেষ করে দিতে চলেছি। শুধু তোমাকে দেখবার লোভ সামলাতে পারিনি, আমাকে মাপ করো।'

'ছি! ওসব কথা বলতে নেই। ওপরে চলো। এক কাপ চা খাও ত আগে। তারপর সব শুনব।'

'না—না, তুমি বুঝতে পারছনা মাধবী—'

'বুঝতে পেরেছি, চলো। জীবন শেষ করার ঢের সময় মিলবে।'

সে ওর হাত ধরে ওপরে নিয়ে যায়।

রমেন একটা চৌকীতে অবসন্নভাবে ব'সে পড়ে বলে, 'তোমার জীবন সামনে প্রসারিত হোক। তুমি আমাকে ভুলে নিশ্চিন্ত হও মাধবী, কিন্তু আমার কলঙ্কিত জীবনের এই শেষ।'

'কলঙ্কিত জীবন ত আমারও গো। দেখোনি তুমি, আমি যে সব কলঙ্ক তোমার সঙ্গে ভাগ ক'রে নিয়েছি।'

'তার মানে?'

চাকরকে ডেকে রাস্তার মোড়ে পাঠায় মাধবী। 'আমার দেশ' এনে খুলে ধরে ওর চোখের সামনে।

'এ কী করলে মাধু?'

'ঠিকই করেছি। তোমার ভালবাসা যে অসম্পূর্ণ হয়ে এসেছিল আমার কাছে। তোমার শুধু সুখের ভাগই দেবে, দুঃখের ভাগ—কলঙ্কের ভাগ দেবে না?

'তবু—রমেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নাম থেকে এ কালী কী কোন দিন মুছবে।'

'নাইবা মুছল। এত সহ্য করলে আমার জন্যে, এটুকু পারবে না?'

'কী জানি। সব যেন গুলিয়ে যাচ্ছে মাধবী।'

'তুমি লক্ষ্মী হয়ে বসো দিকি। আমি তোমার জন্যে জলখাবার নিয়ে আসি। আমিও কাল খাইনি কিছু। একসঙ্গে বসে উপবাস ভাঙব।'

মাধবী যখন খাবার নিয়ে ফিরে এল তখন রমেন ঘুমিয়ে পড়েছে।*

* কোন এক বিখ্যাত মার্কিন সাহিত্যিকের জীবনের একটি ঘটনার প্রভাব এই কাহিনীতে আছে।

—দ্বিতীয়—

সুখের সন্ধান

'কার চিঠি এলগো?' অরুণা রান্না ঘর থেকে প্রশ্ন করে।

বিজয় চিঠি থেকে মুখ না তুলেই বললে, 'তাইত! কী করা যায় বলো দিকি!'

'কেন? কিসের কি?' উদ্বিগ্ন মুখে অরুণা এসে দাঁড়ায় এ ঘরে।

'দাদা আসছেন।'

'দাদা? কোন দাদা?' অরুণা বুঝতে না পেরে তাকিয়ে থাকে।

'তোমার দাদা গো, আমার সম্বন্ধী।'

'ওমা, সে কি!' দুজনেই কিছুক্ষণের জন্য স্তব্ধ হয়ে যায়।

'তা আসেন ত আর কি করা যাবে। বারণ ত আর করা যায় না।'

খানিক পরে সহজ ভাবেই বলে বিজয়।

'কিন্তু—কিন্তু তিনি থাকবেনই বা কোথায়? এই একখানা ঘর আমাদের, তাও এক তলার ঘর—তা ছাড়া তিনি বড্ড বাবু, তুমি জান না।'

'কিছু কিছু জানি বৈকি! তিনিও ত আমাদের অবস্থা জানেন, জেনে শুনেই ত লিখেছেন।'

'হাঁ, তা অবশ্য বটে। শুনেছি ওঁর অবস্থা ভাল যাচ্ছে না। তবু—'

দুশ্চিন্তায় অরুণার ভ্রূকুটি কিছুতে ললাট থেকে মুছতে চায় না। আর দুশ্চিন্তার কারণও আছে বৈকি।

বিজয় ইস্কুল মাষ্টার—কোন এক ইস্কুলের নিচের দিকে ভূগোল ও স্বাস্থ্য পড়ায়। মাহিনা সত্তর, মাগ্‌গি ভাতা ইত্যাদি নিয়ে এক'শ দুই। এ থেকে প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের এবং দেনার কিস্তি কেটে নিয়ে যা থাকে তা ঘর ভাড়া, ঝিয়ের মাইনে এবং মণ-দুই কয়লা কিনতেই চলে যায়। দেনাটা অবশ্যম্ভাবী। প্রতি বৎসরের এগারো মাস বিজয় প্রতিজ্ঞা করে যে আর কখনও ধার করবে না কিন্তু দ্বাদশ মাসে পূজার পূর্বে সে প্রতিজ্ঞা অতলে তলিয়ে যায়। ঠিক যেটুকু শোধ হয় সেইটুকুই ধার ক'রে আবার চলে এগারো মাস ধরে শোধ দেবার সুদুশ্চর তপস্যা।

সুতরাং সংসারের বাকী খরচগুলো সবই পড়ে থাকে। অতএব ইস্কুল মাস্টারের যা একমাত্র সম্বল, টিউশনী করতে হয়। সকালে একটার বেশী হয়ে ওঠে না—কারণ বাজার হাট আছে, বিকেলে ইস্কুল থেকে ফিরে একটু জলযোগ করেই বেরিয়ে সে ফেরে একেবারে রাত দশটায়। এরপর থেকে ইস্কুলের কয়েক দফা পরীক্ষার খাতা দেখা। বছর দুই ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোলের খাতাও পাচ্ছে। আর আছে গরমের ছুটিতে—পাওয়া গেলে কিছু অর্থপুস্তক লেখার কাজ—পূজোর ছুটিতে এক আধখানা পাঠ্য পুস্তক। এর অধিকাংশই বেনামে বার হয়—সামান্য কিছু নগদ দক্ষিণা মেলে লেখকের ভাগ্যে।

এমনি নানা উঞ্ছবৃত্তি করে শ' দেড়েক টাকা আসে গড়পড়তায়, তাইতে কায়-ক্লেশে সংসার চলে। অবশ্য মাত্র দুটি সন্তান হয়েছিল ওদের, তার একটিও নেই। তবু এই বাজারে কি সহজ কথা! অরুণা খুব হিসেবী মেয়ে বলেই সম্ভব

হয়। বছরে কোন এক সময় বাড়তি কিছু টাকা হাতে এলেই সে দুজনের কাপড়-জামা, বিছানার চাদর, জুতো ইত্যাদি দমকা খরচগুলো সেরে নেয়। তাই মাসিক আয়টা যত কমই হোক, অশোভন রকমের টানাটানি পড়ে না।

সে যাই হোক—ওদের যেমনই চলুক, অভাবের সময় শুধু ডালভাত খেয়ে অরুণা যেমন থাকতে পারে, স্বামীর সামনে ধরে দিতেও তার বাধে না। তবে, তাই বলে তার দাদা? সে ত জানে নির্মল কি ভয়ানক বাবু, কি অসাধারণ বিলাসের মধ্যে প্রতিপালিত! তাঁকে এইখানে কল্পনা করতেই তার মাথা ঝিম করে। বাপের বাড়ীর ঐশ্বর্যের যে স্মৃতি গত দশ বছরে প্রায় সে ভুলতে বসেছিল আজ সেইটেই নতুন করে মানসচক্ষে ফুটে ওঠে। বিশেষ করে মনে আছে চওড়া মার্বেল পাথরের সিঁড়িটা। বিলিতি ধরণে হলের মধ্য দিয়ে সিঁড়ি, ওপরের বিস্তৃত বারান্দা হয়ে উঁচু উঁচু ঘর। বাবার অম্বুরি তামাকের গন্ধ, গোলাপ জল দিয়ে যে গড়গড়া ভরা হত—তারই মৃদু শব্দ। অসংখ্য চাকর দাসী—

না, সে কথা থাক। সে বহুকালের কথা, তার দাদা আর কিছুই রাখেন নি, বাড়ী বিক্রী হয়ে গেছে, গেছে সেই সঙ্গে যত ভাল ভাল ফার্ণিচার তার বাবার কেনা। মার্বেল পাথরের স্ট্যাচুগুলোর জন্য সবচেয়ে দুঃখ ওর। কিছুই নেই, ওর বাল্যের স্মৃতিতে আছে এমন কোন জিনিস আর নেই। বাবা রাগ করে তার

মায়ের গহনাগুলো দেননি ওকে।…তাহলে তবু থাকত। বেশ হয়েছে—যেমন দেননি! হিংস্র এক রকমের আনন্দ বোধ করে সে—

চমক ভাঙ্গে বিজয়ের কথায়, 'তোমার মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়ল মনে হচ্ছে! আমরা ত আমন্ত্রণ করতে যাইনি, তিনি নিজেই আসছেন। তবে আর ভাবনা কি। নাও চট্ করে কী খেতে দেবে দাও দিকি—এখনই ত ছুট্‌তে হবে। কাল বাগবাজারের ছাত্তর আবার টুকেছে, মাষ্টার মশাইয়ের জন্যে আমি খেলা কামাই ক'রে বসে থাকি, মাস্টার মশাই কিন্তু সন্ধ্যার আগে একদিনও আসেন না। নাও চট্‌পট্—'

অরুণা তাড়াতাড়ি ছুটে যায় রান্নাঘরে, চায়ের জল বসিয়ে ছোট একটা কলাই-করা বাটিতে হাল্‌কা হাতে তেল মাখানো মুটি মুড়ি এবং তার ওপর কিছু আলু চচ্চড়ি এনে সাম্‌নে ধরে। তারপর প্রশ্ন করে, 'কবে আসছেন দাদা? কোথা থেকে চিঠি দিয়েছেন।'

'পড়ে ছাখো না।'

'আমার এখন বিস্তর কাজ। পরে ধীরেসুস্থে পড়ব 'খন। তুমি বলোই না—'

'পরশু এসে পৌঁচচ্ছেন। নাগপুর থেকে চিঠি দিয়েছেন।'

'পরশু। তাহলে ত আর সময় নেই—'

'কেন? কিসের সময়?'

'একটু যদি চুনটুন ফিরিয়ে নেওয়া যেত—'

'তুমি থামো। এর মধ্যে চুন ফেরাবে? খরচের কথা ত ছেড়েই দাও, ঝঞ্ঝাটই কি কম? আর কেন, কিসের জন্য আমরা তা

পরব। তাঁদের যখন সুসময় ছিল, তাঁরা একবার স্মরণ করেছিলেন? আমি না হয় পর—তুমি? কই বোনকে ত কখনও দুটো টাকা পাঠিয়ে বলেন নি, সন্দেশ কিনে খাস—'

চোখের জল চোখেই চেপে অরুণা তাড়াতাড়ি চলে যায়। চা তৈরী করতে বসে উনুনের পাশে হেঁট হয়ে। স্বামীর ওপর নয় —দাদাদের ওপরই অভিমানে চোখে জল আসে ওর। কিন্তু তাই বলে, এই বাড়ীতে—ওর সেই দাদা? ভাবতেই যেন কেমন লাগে।

যে ঘরটায় থাকে ওরা, তার প্রায় তিনদিকই চাপা। রাস্তার দিকে একটা জানলা আছে ঠিকই, কিন্তু সে রাস্তাও ত ষোল ফুট গলি। আর একটা জানলা আছে পূবে, কিন্তু পাশের বাড়ীর দেওয়ালের সঙ্গে তার ব্যবধান মাত্র তিন ফুট। সে বাড়ীর ছাদের ট্যাঙ্ক ফুটো হয়ে বারো মাস জল পড়ে দেওয়াল বেয়ে, তার ফলে দেওয়ালটা ভিজে স্যাওলা ধরা এবং পলেস্তারা ওঠা। জানলাটা খুললেই ভ্যাপ্‌সা পচাগন্ধ আসে একটা। সেজন্য বন্ধ করেই রাখতে হয় সেটা। বাড়ীর উঠান এক ফালি, সেদিকে দোরটা খোলা থাকলেও না আসে আলো, না আসে হাওয়া। আর এই রান্না ঘর—'ছ ফুট বাই আট ফুট', এর এই একটিই অদ্বিতীয় দরজা—গরমের সময় এখানে রান্না করা মানে হাঁড়িতে সরা চাপা অবস্থায় সিদ্ধ হওয়া। এই ঘর আর রান্নাঘরের মধ্যে সঙ্কীর্ণ বারান্দার একটা ফালি চলে গেছে। তার তিনদিক চাপা; সেটি চলন হিসাবেই ব্যবহার হ'তে পারত, তবে নাকি চ'লে বেরোবার পথ নেই। তাই তাতে এখন থাকে ওদের ঘুঁটে কাঠ এবং জুতো।

এইটুকুর জন্যেই ভাড়া দিতে হয় চল্লিশ টাকা, তাছাড়া ইলেক্‌ট্রিক এবং ট্যাক্স। এর আগে ওরা যেখানে ছিল সেখানটায় তবু দুটো ঘর ছিল, তার মধ্যে একটা দোতালায়। ওরা যাদের ভাড়াটে ছিল, তারা গোটা বাড়ীটার ভাড়া বছর দেড়েক বাকী রাখায় যখন বাড়ীওলা উঠিয়ে দিলে তখন বিজয়দেরও উঠে আসতে হল। তারপর এই দুর্গতি। তখন যদি দাদা আসতেন!

চা নিয়ে আসতে আসতে হঠাৎ অরুণার কথাটা মনে পড়ল, 'হ্যাঁগো দাদা আমাদের ঠিকানা পেলেন কি ক'রে?'

বিজয় সে কথাটার জবাব না দিয়ে ওর মুখের দিকে অদ্ভুত এক প্রকার দৃষ্টি মেলে বললে, 'আমি ভুলেই যাই যে তুমি প্রচণ্ড বড়লোকের মেয়ে। সত্যি, বড় দুঃখ পেলে তুমি আমার হাতে পড়ে—'

'যাও।' অরুণা রাগ ক'রে বলে, 'জন্ম-জন্মান্তর যেন আমি এই দুঃখই পাই। এ ছাড়া আর কোন প্রার্থনা জানি না।'

চা শেষ করে উঠে দাঁড়িয়ে জামাটা কোনমতে গলিয়ে নিলে বিজয়, তারপর অরুণাকে অকস্মাৎ একেবারে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে চুমো খেয়ে, কোঁচার খুঁটে ওর মুখের ঘাম মুছিয়ে দিয়ে প্রায় ছুটেই বেরিয়ে গেল।...

অরুণার কিন্তু খেয়াল রইল না যে ওঘরে তার উনুন জ্বলে যাচ্ছে। এখনও খাবার করা প্রায় সবই বাকি। বিজয়ের কথাগুলো যেমন জীবনের একটা আনন্দময় অনুভূতির তন্ত্রীতে ঘা দিয়েছে তেমনি একটা বেদনা-বিজড়িত ইতিহাসের ওপর থেকেও পর্দা সরিয়ে নিয়েছে—

অরুণার বাবা প্রচণ্ড বড় লোকই ছিলেন। তিন পুরুষে বড় লোক। জমিদার ঠিক নয়—কলকাতা শহরেই অনেকগুলো বাড়ীর মালিক ছিলেন তাঁরা। তাছাড়া অবিনাশবাবু নিজেও অনেক টাকা উপার্জন করেন নানা ব্যবসায়ে। তাঁরই একমাত্র কন্যা সে। আদরিণী কন্যা।

অরুণার মা যখন মারা যান অরুণা তখন শিশু। সেই অভাব ভোলাবার জন্যই বোধ হয় অবিনাশবাবু বিলাস এবং ঐশ্বর্যের আড়ম্বরে ডুবিয়ে রেখেছিলেন কন্যাকে। ওর মুখের কথা খসানো মাত্র সে জিনিস না পেলে কারুর রক্ষা থাকত না। দুঃখ এবং অভাব এ শব্দ দুটি কোন কোন বইয়ে পড়লেও এর অর্থ সম্বন্ধে অরুণার ধারণা ছিল সম্পূর্ণ অস্পষ্ট।

তারপর কোথা থেকে এল বিজয়, ওঁদের কোন পুরানো কর্মচারীর বাপ-মা মরা ছেলে। ম্যাট্রিকে স্কলারসিপ পেয়ে ইণ্টারমিডিয়েট পড়তে এল কলকাতায়। কথা ছিল অবিনাশবাবু খরচ দেবেন, সে হোস্টেলে থেকে পড়বে। কিন্তু কলেজে ভর্তি হবার আগে অল্প যে কদিন ওদের বাড়ীতে ছিল তাতেই যে ওকে কি চোখে দেখলে অরুণা—ওর গৌরবর্ণ বলিষ্ঠ চেহারা এবং বুদ্ধিদীপ্ত ললাটে যে কি জাদু মাখানো ছিল—হঠাৎ সে-ই বাবাকে বলে বসল, 'এখানেই থাক না বাবা! অনেক ঘর ত খালি আছে। আহা, ওর মা-বাবা নেই। একা সেই হোস্টেলে পড়ে থাকবে!'

অরুণার ইচ্ছাই যেখানে আইন, সেখানে এতটুকু বলাই যথেষ্ট। অবিনাশবাবু বললেন, 'তাই হোক তবে। মন্দ কি, তোর পড়াটড়া-গুলোও একটু দেখতে পারবে।'

তখন অরুণার বয়স সতেরো। বিজয়ের উনিশ কুড়ি।

তার পরের ইতিহাস সংক্ষিপ্ত এবং অনুমেয়। বিজয় যখন ফোর্থ ইয়ারে পড়ছে হঠাৎ অরুণা বাবাকে গিয়ে বললে, 'বাবা, আমি ওকে বিয়ে করব—'

'কাকে রে?' বাবা হিসেবের খাতা থেকে অবাক হয়ে মুখ তুলে তাকান। এরকম কথা সে বলত বাল্যকালে প্রায়ই, কিন্তু জ্ঞান হবার পরে ত—

'ঐ যে ওকে।' বিজয়ের ঘরের দিকে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়।

'ওকে মানে? বিজয়কে! দূর পাগলি!'

'না বাবা এ আমার খেয়াল নয়। আমি ভাল করেই ভেবে দেখেছি।'

'আচ্ছা, আচ্ছা যা হবে 'খন। সে সব কথা ভাববার ঢের দেরি।'

'দেরি নেই বাবা। দিন স্থির করেছি, তুমি রাজী হও।'

ওর কণ্ঠস্বরে কী ছিল, অবিনাশবাবু আবারও মুখ তুলে তাকালেন। বেশ দৃঢ় কণ্ঠেই বললেন, 'তোমার বিয়ে আমি কার সঙ্গে দেব না দেব সে আমি বুঝব। ছেলে বেছে বিয়ে দেব—সে সময় না হয় তোমার মত নেব। কিন্তু তোমার বিয়ের পাত্র এবং দিন তুমি ঠিক করবে এটা আমার পছন্দ নয়।'

তারপর একটু থেমে একটু ক্রূর দৃষ্টিতে বিজয়ের ঘরের দিকে চেয়ে বললেন, 'সাপকে যতই দুধ খাওয়াও সে সাপই থাকে। ঐ জন্যই লোকে বলে ভগবান যাকে দুঃখ দেন তার উপকার করতে নেই। কেউ নেই ব'লে ঘরের ছেলের মত স্থান দিয়েছি—সমস্ত অভাব দূর করেছি, তার এই কাজ! মনে করেছে যে বড় লোকের বোকা মেয়েকে ভুলিয়ে বেশ দু পয়সা হাতাবে। সে পাত্র আমি নই মা, সেটা ওকে বুঝিয়ে দিও!'

অপমানে অরুণার মুখ লাল হয়ে উঠল, সে তবু শান্ত স্বরেই বললে, 'তুমি জানো না বাবা যে এ প্রস্তাব আমিই ওর কাছে করি, আর তখন সে প্রথম সর্ত ক'রে যে কখনও সে ঘরজামাই থাকবে না, আর তোমার কাছ থেকে কোন আর্থিক সাহায্য নেবে না। আমাকেও নিতে দেবে না।

উচ্চাঙ্গের হাসি হেসে অবিনাশ বাবু বললেন, 'ওটা ত আরও বড় চাল!'

অরুণা আর কথা কইলে না। উঠে চলে গেল সেখান থেকে।

অবিনাশবাবু কিন্তু তখনই বিজয়কে ডেকে পাঠালেন, প্রচণ্ড এক ধমক দিয়ে বললেন, 'তুমি আজই এ বাড়ী ছাড়বে। তোমার মত বেইমানের ওপর কোন বিবেচনাই থাকা উচিত নয়, তবু এতকাল ছেলের মতই ছিলে, তাই বলছি যত দিন না বি. এস. সি পাশ করো ততদিন তোমার খরচা আমি দেব, আমার অফিসে দেখা ক'রে সরকারের কাছ থেকে তা নিয়ে যাবে।'

'যে আজ্ঞে' বলে বিজয় চলে এসেছিল। বাড়ী ছেড়ে দিলে সেই দিনই কিন্তু আদেশের বাকীটা পালন করেনি অর্থাৎ মাসিক ভিক্ষাটা নিতে যায় নি। ছোট ছোট টিউশ্যনী করে নিজের বাকী ক-মাসের খরচা চালিয়েছে।

বি. এস. সি পরীক্ষা শেষ হবার পর অরুণা একদিন এসে বাবাকে প্রণাম করলে। বাবা বিস্মিত হয়ে বললেন, 'এত ভক্তি কেন মা?'...

অরুণা মাথা হেঁট করে বললে, 'আমার বিয়ে যে বাবা।'

'বিয়ে? সে কি?'

সেদিনের পর থেকে অরুণা এ প্রসঙ্গে একটি কথাও বলেনি। বিজয়কে বাড়ী থেকে তাড়ানো নিয়ে কোন প্রতিবাদ করে নি এমন কি তার নামও করেনি কখনও। কথাটা অবিনাশ বাবু ভুলেই গিয়েছিলেন তাই। এখন খানিকটা অবাক হয়ে চেয়ে থাকবার পর কথাটা বুঝলেন, 'তোমার অনেক বাচালতা ও ধৃষ্টতা আমি সহ্য করেছি কিন্তু আর নয়। পাগলামী যদি হয়ে থাকে ত তা সারাতেও আমি জানি।'

এবার অরুণা মুখ তুললে, বেশ দৃঢ় কণ্ঠে বললে, 'আমিও তোমার শাসন অনেক সয়েছি বাবা। কিন্তু আর নয়। আইনত কোন বাধা দিতে পারো না—আমার সে-বয়স পার হয়ে গেছে। গায়ের জোর বা টাকার জোরে যদি বাধা দিতে চাও ত এই তোমার নামে দিব্যি করেই বলছি, ছাদ থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে মরব। তুমি ত জানো আমি মিছে কথা বলি না।'

অবিনাশ বাবু অগ্নিবর্ণ হয়ে উঠলেন ক্রোধে। বললেন, 'কিন্তু এটা জেনো যে এক পয়সা কোন দিন পাবে না আমার কাছ থেকে। ঐ পপারের ঘর করতে গেলে ভিক্ষা করতে হবে। তোমার শুধু টয়লেটের যা খরচা তা ও ছ মাসেও রোজগার করতে পারবে না।'

'তা জানি, সেক্ষেত্রে টয়লেটটাই বাদ দেব। মানুষের ভোগের ইচ্ছা ত কমে না বাবা, ওর শেষ নেই। সুতরাং যে-কোন অবস্থায় তুষ্ট থাকাই ভাল। সে শিক্ষা আমি পেয়েছি।'

অবিনাশ বাবু ক্রোধে দিশেহারা হয়ে বলেছিলেন, 'এখান থেকে কিছুই নেওয়া চলবে না। এক কাপড়ে বেড়িয়ে যেতে হবে—'

'তাও জানি বাবা। এ হারটা আমার এক জন্মদিনে দিদিমা দিয়েছিলেন, এ দুটো বালা দেন মাসিমা। এ শাড়ীখানাও তোমার নয়--এ উনিই কিনে দেন ওঁর স্কলারশিপের টাকা থেকে। তোমার কিছুই নিয়ে যাবো না, এই প্রতিজ্ঞা করেছি ওঁর কাছে।'

নির্মল সেদিন অনেক বুঝিয়েছিল বোনকে। বলেছিল, 'তুই কি পাগল হলি? অভাবের মধ্যে কোন ভালবাসাই থাকবে না। আজ যেটাকে তুই সব মনে করছিস তখন দেখবি তার কোন মূল্যই নেই। এ দুনিয়ায় আসল হ'ল পয়সা। না না অরু, আমার কথা শোন, পাগলামি করিসনি। সে হয়ত একখানা ঘরে নিয়ে গিয়ে তুলবে, হয়ত বা ঝি চাকরও রাখতে পারবে না—সে তুই একদিনও থাকতে পারবি না। তখন আর ফেরবার পথ পর্যন্ত থাকবে না, সে একটা ধাস্টামো, কেলেঙ্কারী—সে বিশ্রী ব্যাপার হবে!'

আমি সব দিক ভেবেই দেখেছি দাদা। সব রকম দুঃখ কষ্ট সইবার জন্য প্রস্তুত হয়েই যাচ্ছি।'

সেই যে অরুণা বেরিয়ে এসেছিল দশ বছর আগে, আর কোন দিন বাপের বাড়ীতে যায় নি। ওর বাবা অবিনাশবাবু বিষম জেদী লোক, তিনি মরবার আগেও কন্যাকে খবর দিতে দেন নি। ওরা খবর পেয়েছিল সংবাদপত্র মারফৎ। তারপরের খবর অরুণা সব জানেও না। বিজয় জানে, অনেক খবরই জানে কিন্তু সে-ও অরুণাকে কোন দিন বলেনি—দুঃখ পাবে বলে।

শুধু মোটামুটি অবস্থাটা জানে অরুণা। বাবা মরবার পর তাঁর পুরোনো ব্যবসা নির্মলের পছন্দ হয়নি, সেসব অফিস তুলে দিয়ে নিজে নানা কারবারে নাক গলিয়েছে কিন্তু কোনটাতেই টিকে থাকতে পারেনি—শুধু অজস্র অর্থ নষ্ট হয়েছে। এর ওপরে ছিল ওর অতিরিক্ত বিলাস,—সম্ভোগের নানা উপকরণে নিজেকে ডুবিয়ে রাখত, তবু তৃপ্তি হত না ওর। সবচেয়ে দামী এবং সবচেয়ে দুষ্প্রাপ্য কিছু না হ'লে ওর চলত না। সে রেস খেলেনি, শেয়ার মার্কেটে জুয়া খেলেছে। ঘরে সুন্দরী স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও স্ত্রীলোক কামনা করেছে সে, কিন্তু সে-স্ত্রীলোক বাজারের হলে চলবে না। তথাকথিত সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ের জন্য হাজার হাজার টাকা খরচ করেছে, অর্থাৎ চতুর দালালরা ঠকিয়েছে, বায়নারীই সরবরাহ ক'রে।

কুবেরের ঐশ্বর্য নয়, কয়েকখানা বাড়ী ও কয়েক লক্ষ টাকা। সুতরাং বলাই বাহুল্য যে বেশী দিন সে টাকা টেকেনি। সব যখন গেছে তখন ঋণ করেছে। তারপর অভাবের সঙ্গে সঙ্গে ধাপে ধাপে নেমে এসেছে সে। এত নীচে নেমেছে যে সে ইতিহাস বিজয় অরুণার সামনে মুখে উচ্চারণ করতে পারেনি।

সে-ও আজ প্রায় দু বছরের কথা। এ দু'বৎসর ওর কোন খবরই পায়নি বিজয়। অকস্মাৎ মাসখানেক আগে ইস্কুলের ঠিকানায় এক চিঠি পায়, 'নিদারুণ অভাবে পড়েছি—যা পারো পাঠাও।' এই দারিদ্র্যের মধ্যেও বিজয় যেমন করেই হোক পঞ্চাশটি টাকা পাঠিয়েছিল, এর কম পাঠাতে সঙ্কোচে বেধেছিল ওর। সে কথা অরুণা জানে না। সেই সূত্রেই বাড়ীর ঠিকানা পেয়েছিল নির্মল। তার পর একেবারে এই—।

ফিল্মের চলমান দৃশ্যের মতই অতীতের বহু ঘটনা অরুণার চোখের সামনে দিয়ে সরে সরে যায়। বাল্য, কৈশোর—যৌবনেরও বহু চিত্র। চোখে জল এসে যায় একসময়, তাড়াতাড়ি চোখ মুছে নিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে রান্নাঘরে চলে যায়। দুঃখ ওর নিজের অবস্থার জন্য নয়, দুঃখ ওর বাবার জন্য—ওর দাদার জন্য। বাবা ভুল বুঝলেন ওকে, সে ভুল ভাঙবারও অবসর পেলে না সে।

যথাসময়ে নির্মল এসে পৌঁছল। সঙ্গে শুধু দুটি স্যুটকেস—বিছানা-পত্র পর্যন্ত নেই। এসেই বেশ সপ্রতিভ ভাবে বিজয়কে ডেকে বললে, 'ওহে বিজু, ট্যাক্সী ভাড়াটা দিয়ে দাও ত। আমার কাছে এখন খুচরো নেই। তিন টাকা দশ আনা বুঝি? ঐ চারটে টাকাই দিয়ে দাও ওকে—'

অরুণা স্বামীর মুখের দিকে একবার তাকিয়ে বললে, 'তোমার সঙ্গে ত মালপত্র বেশী নেই দাদা—বাস-এ এলে না কেন?'

'আমি বাসে আসব? বলিস কি? ঐ যত রাজ্যের ছোটলোকের সঙ্গে ধাকাধাক্কি করে—দুর্গন্ধ সব জামা-কাপড়ে! না না অরু, সে আমি পারব না।'

আর কিছু বললে না অরুণা। নির্মল ঘরের মধ্যে ঢুকে বললে, 'ইস, তোদের ঘরটা কি ড্যাম্প রে! এ ধারের জানলাটা খুলিস না কেন?'

সে নিজেই এগিয়ে গিয়ে খুলে দিলে জানালাটা।

'এ রাম! কী ভ্যাপসা দুর্গন্ধ এখানে, থাকিস কি ক'রে। না না বিজয়, ভাড়া দিয়ে এ ঘরে থাকবার কোন মানে হয় না।'

বিজয় হেসে বললে, 'দিন না দেখে এর চেয়ে ভাল ঘর! তাই চল্লিশ টাকা ভাড়া।'

'তা এ তোমার অন্যায় কথা। এ বাজারে চল্লিশ টাকায় ভাল ঘর তুমি আশা করো কেমন করে? অন্তত শ' খানেক টাকা হলেও পাওয়া যায় একটা ছোট ফ্ল্যাট।'

জবাব দিলে অরুণাই, 'তুমি ভুলে যাচ্ছো দাদা যে একশ টাকাই ওঁর মাসিক আয়।'

'অ। তাই নাকি।'

ধপাস্ ক'রে ওদের তক্তপোষে পাতা বিছানাটায় বসে পড়ে সিগারেট ধরায় নির্মল, 'তোরা শুস কোথায় রে? খাট-টাট নেই?'

'খাট ত বিয়েতে মেয়ের বাপ-মা দেয়। তোমরা দিয়েছিলে?'

'তা বটে। যা বিয়ে করলি। তাই ত! এই বিছানায় শুস কি ক'রে, একটা গদিও ত নেই।'

বিজয়ের মুখের উপর অপ্রসন্নতার মেঘ ঘনিয়ে আসছে দেখে তাড়াতাড়ি অরুণা বলে, 'যাই জল চড়াই গে, চা খাবে ত?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ। তা তুই যাবি কেন? ঠাকুর নেই?'

'তুমি পাগল? একশ টাকা আয়ে ঠাকুর?'

নির্মল চুপ করে যায়।

চা জলখাবার খেয়ে বলে, 'তোদের বাথরুমটা কোথায় রে?'

'ঐ একটু অসুবিধা দাদা, বাথরুম বলে কিছু নেই। কলতলায় দাঁড়িয়ে চান করতে হয়। পাঁচজনের বাড়ী ত! শুধু মেয়েদের জন্যে একটু ঘেরা জায়গা আছে।'

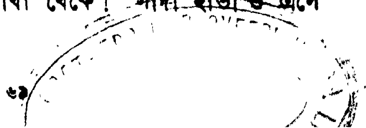
'বলিস্ কি? এখানে থাকাই ত মুস্কিল আমার দেখছি।'

এইবার আর বিজয় থাকতে পারলে না। বললে, 'আমাকে ত একটু জানাবার অবসর দিলেন না, তাহ'লেও না হয় এ সবগুলো লিখে দিতুম—'

নির্মল কিন্তু অপ্রতিভ হয়না, বলে, 'না তার জন্যে নয়—যেতুমই বা কোথায়? কলকাতায় এখন কিছুদিন থাকা দরকার। যা-হয় একটা কিছু ত করতে হবে। ওহে এক প্যাকেট সিগারেট আনাও দিকি কাউকে দিয়ে, একদম নেই দেখছি। ভাল সিগারেট আনিও, আমি আবার যা-তা খেতে পারি না।'

এদের সংসারে কোন জিনিসেরই প্রাচুর্য নেই। সুতরাং বিছানার ব্যবস্থা করতে হ'ল অরুণাকে বাড়ীর অন্য ভাড়াটেদের কাছ থেকে ধার ক'রে। কিছু কিছু বিজয়কে কিনে আনতেও হ'ল। নির্মল ওদের শয্যাটি সহজেই দখল করে রইল। তারপক্ষে মেঝেতে বিছানা ক'রে শোবার কথা কেউ ভাবতেও পারলে না। অগত্যা অরুণাকে মেঝেতে একটা বিছানা করতে হ'ল এবং বিজয়কে আশ্রয় নিতে হ'ল সেই অন্ধকার চলনটায়। যতদূর সম্ভব পরিষ্কার করে নেওয়া হয়েছে তবু অরুণার ভয় যায় না, 'কী বিছে মিছে বেরোবে, কে জানে সাপ-খোপ থাকাও আশ্চর্য নয়। হ্যাঁ গো সরু একটা তক্তপোষ কত নেয়?'

'সে অনেক। আমি বাবা এখন একেবারে পেনিলেস। চার পাঁচ টাকাই বা খরচ করি কোথা থেকে! সাদা হাতী ত এসে বসেছেন এধারে।'



'হ্যাঁ গো, যাবে কবে?'

'সে তুমিই জানো। তোমার বাবা বড় দুঃসময়ে আশ্রয় দিয়েছিলেন, তাঁর ছেলে এসে থাকে থাক যতদিন খুশী, না হয় একটু কষ্টই করলুম, তবে ওসব বড়মানষি না দেখায়, তাহ'লে কিন্তু একদিন যা-তা বলব বলে দিলুম।'

অরুণা কিছুক্ষণ মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে থেকে বললে, 'কিছু টাকা থাকলে ওকে কোন মেসে পাঠিয়ে দিতুম।

'সেটা যখন নেই তখন আপাততঃ সে কথা থাক। তুমি শুয়ে পড়োগে।'

ভেতর থেকে নির্মল ডেকে বলে, 'কাল একটু মাটন্ আনিও হে বিজয়, অনেকদিন গ্রাম্‌ফেড মাটন্ পেটে পড়েনি—বরং পারো ত নিউ মার্কেটে যেও।

অরুণা এসে আলো নিভিয়ে তার মেঝেয়-পাতা বিছানায় শুয়ে পড়ে। খানিক পরে নির্মল কতকটা ফিস ফিস ক'রে বলে, 'বাস্তবিক তুই কী করলি বল দিকি, মিছিমিছি এই কষ্ট আর দারিদ্র্য! এখন ত বুঝতে পাচ্ছিস তোকে আমি সৎপরামর্শ ই দিয়েছিলুম। এমন যে হবে এ আমি জানতুম।'

'তুমি কিছুই জানতে না দাদা। এ তুমি বুঝবে না। আমি যথেষ্ট সুখেই আছি। এখন চুপ করো দিকি। উনি শুনতে পাবেন।'

নানা প্রকার মূল্যবান্ নেশা করার ফলে রাত্রের ঘুম বহুদিনই নির্মলের চলে গেছে। প্রথম রাত্রের তন্দ্রা রাত একটা নাগাদ

ভেঙে যায় রোজই, আর ঘুম হয় না তারপর। আজও যথাবিহিত ঘুম ভাঙে ওর। অভ্যাসবশতঃ বালিসের পাশ থেকে সিগারেট টেনে নিয়ে ধরায় সে। কিন্তু সেই একমুহূর্তের দেশলাই জ্বালার ফাঁকেই দেখে নেয় অরুণার বিছানা খালি।

প্রাকৃতিক প্রয়োজনে বাইরে গেছে মনে ক'রে সে বিশেষ উদ্বিগ্ন হয় না, নিঃশব্দে সিগারেট টানতে থাকে। কিন্তু প্রায় মিনিটে পনেরো কেটে যাবার পরও অরুণা ফিরল না দেখে সে একটু উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। কিছুটা কৌতূহলীও।

অন্ধকারে এতক্ষণে চোখ অভ্যস্ত হয়েছে, নির্মল উঠে এসে ঘরের আলোটা জ্বাললে। দেখলে দোর ভেজানো, অর্থাৎ বাইরেই গেছে। কপাট খুলে বাইরে এসে হাতড়ে সুইচ টিপে সেখানের আলোটাও জ্বাললে। তার ফলে যে দৃশ্য ওর চোখে পড়ল তার জন্য সে মোটেই প্রস্তুত ছিল না। চলনের সেই সঙ্কীর্ণ শয্যাতেই একেবারে ঘেঁষাঘেঁষি জড়াজড়ি করে শুয়ে ঘুমোচ্ছে বিজয় আর অরুণা। একেবারে অঙ্গাঙ্গীভাবে ঘনিষ্ঠ ওরা। অসহ্য গরম, ঘামে ওদের সর্বাঙ্গ ভেসে যাচ্ছে তবু কারুরই তাতে কোন অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ নেই, অর্থাৎ ঘুমের কোন ব্যাঘাত হচ্ছে না। স্বামীর কাছ থেকে স্বতন্ত্র হয়ে শুয়ে বোধ হয় ঘুম হয়নি অরুণার, কোন-এক ফাঁকে তাই এখানে চলে এসেছে।

সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কেমন একটা অদ্ভুত চাহনি ফুটে ওঠে নির্মলের দৃষ্টিতে। কোন অভিধা দিয়ে বোঝানো যাবে না সে দৃষ্টি। কতক হিংস্র, কতক বা ক্ষুধার্ত। কিছু হয়

ত বিস্ময়ও ছিল তাতে। অনেকক্ষণ পরে আলো নিভিয়ে আবার ফিরে আসে সে নিজের শয্যায়।

আর কিছুতেই ঘুম হয় না। সিগারেটের পর সিগারেট পোড়ে শুধু। অন্ধকারে সেই রুদ্ধ কপাটের দিকে চেয়ে চুপ করে শুয়ে থাকে নির্মল।...

বিয়ে সেও করেছিল, সুন্দরী স্ত্রী—খুবই সুন্দরী, তবু এমন ভালবাসতে ত পারেনি। কৈ অমলাও ত তাকে এরকম প্রচণ্ড আবেগে ভালবাসেনি কখনও। অথচ সে বিয়ের প্রথম দু'বৎসর বিলাসের উপকরণে—কাপড় ও গয়নায় প্রায় ডুবিয়ে দিয়েছিল তাকে। উপহার চিরকালই দিয়েছে ভাল ভাল, যখন বাইরে তার দু-তিনটি প্রণয়িনী ছিল, তখনও।

হয়ত সুযোগ পায়নি বেচারী। নির্মলের সে অবসর ছিল কোথায়? জীবনের ঘোড়দৌড়ে থমকে দাঁড়িয়ে স্ত্রীর ভালবাসা অনুভব করার সময় ছিল না। হ্যাঁ, ভালবাসত নিশ্চয়ই। তা নইলে অধোগতির যখন চরমে নেমেছে নির্মল, স্ত্রীকে কি রাজী করাতে পারত—ধনবান্ পুরুষের লুব্ধ দৃষ্টির সামনে নিজেকে প্রসারিত করে ধরতে, প্রজাপতির মত সুন্দর ও বিচিত্র হয়ে পুরুষের সঙ্গে ঘুরে বেড়িয়ে তাকে পাগল করে তুলতে? নির্মলের যে তা প্রয়োজন ছিল—একমাত্র অমলার দ্বারা না ভোলাতে পারলে সে-সব মহাজনদের হাত থেকে অত টাকা বেরোত না। নির্মলকে ধার দেবার মত নির্বোধ তারা কেউই ছিল না, যা দিয়েছে ক্ষণকালের জন্য অমলার রূপে মাতাল হয়েই—

অবশেষে আর পারেনি বেচারী। বোম্বাইয়ের হোটেলে নির্মলেরই রিভালভারের এক গুলিতে আত্মহত্যা ক'রে সে সেই অসম্মান ও গ্লানির হাত থেকে চিরতরে রেহাই পেয়েছে—অব্যাহতি দিয়েছে নিজেকে।...তা নইলে আজ কি নির্মলের এ অবস্থা হয়!

হায় রে, এমন জিনিস, যার জন্য দুনিয়া জ্ঞান হারাত—তাকে হাতের কাছে পেয়েও পরিপূর্ণ ভাবে গ্রহণ করতে পারেনি নির্মল। যদি অমলাকে তখন সে একটু ভালবাসত, যদি তাকে বোঝবার চেষ্টা করত!

থাক্ সে কথা। ওসব ভাবতে আজ আর ভাল লাগে না। সে সময় আর নেই।

২

সারারাত জেগে ভোরের দিকে নির্মল বোধ হয় একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল, হঠাৎ ওর যখন চমক ভাঙ্গল তখন দেখলে যে ওর সেটা ওঠবার সময় না হলেও এখানে রীতিমত কর্মব্যস্ততা শুরু হয়ে গেছে। বিজয় বাজার ক'রে ফিরে এসে দাঁড়িয়েছে, অরুণা চা ভিজিয়ে টোস্টের জন্য রুটি কাটছে দ্রুত হাতে। বিজয় চা খেয়েই দৌড়বে টিউশ্যনী করতে। এমনিই একটু বেশী দেরী হয়ে গেছে।

'অরুণাদি'!

একটি মেয়ে এসে ঢুকলো ওদের ঘরে। সতেরো আঠারো বছর বয়সের নিতান্ত সাধারণ চেহারার মেয়ে, উজ্জ্বল

শ্যামবর্ণ, কোথাও কোন অসাধারণত্ব নেই। তবে সর্বদাই একটু মিষ্টি হাসি লেগে আছে বলে কেমন একরকম সুশ্রী বোধ হয় ওকে। এত কথা হয়ত অল্প সময়ের মধ্যে নির্মল ভেবে দেখে না, কিন্তু তার দিকে চেয়ে ওর ভালই লাগে, একটু অবাক্‌ও হয়। কেননা ভাল লাগার কারণ বুঝতে পারে না। চিরদিন বাছাই করা সুন্দরী মেয়েদের নিয়ে কেটেছে ওর। অমলার ত কথাই ছিল না। সুতরাং এই সাধারণ মেয়েকে ভাল লাগা ওর পক্ষে বিস্ময়কর বৈকি!

'অরুণাদি সরো, তুমি চা ছাঁকো গে—আমি টোস্ট্ করে দিচ্চি।'

'আঃ, বাঁচলুম ভাই পারুল। যা তাড়া, আজ আবার উঠতেও একটু দেরি হয়ে গেছে। এক্ষুণি হয়ত উনি রাগ করে চা না খেয়েই চলে যাবেন। দাদা, শুধু এক কাপ চা এখন খাবে ত? বেড্-টি?'

'হ্যাঁ, তাই খাবো। কিন্তু তোদের ব্যাপার কি রে। এখনও ত ওঠবারই সময় হয় নি ভদ্রলোকদের। ভাল করে ফরসা হয়েছে?'

বিজয়ের বিরক্তিটা কণ্ঠ ছাপিয়ে প্রকাশ পায়, 'আমাদের মুটে মজুরদের মত খেটে খেতে হয় দাদা! ভদ্রলোকদের আচরণ নকল করার অবসর কৈ?'

তারপরই স্ত্রীকে এক তাড়া—'কৈ গো, হ'ল?'

'এই যে—চা ত ছেঁকেছি, দে ভাই পারুল চট করে একটু মাখন দিয়ে—'

'না! এক কাপ চা-ও তোমাদের কাছে সময় মত পাবার উপায় নেই। আমি উঠে উনুনে আঁচ দিয়ে বাজার ক'রে নিয়ে ফিরে এলুম—আর তোমরা উঠে একটু চা ক'রে দেবে তাও পারো না!

কী যে করো বুঝি না। যত সব অকর্মণ্য ন্যাকা মেয়ে মানুষ!'

তীব্র ঝাঁজ বিজয়ের কণ্ঠে। বিস্মিত হয়ে যায় নির্মল। কৈ অরুণা ত রাগ করে না একটুও। বরং কেমন যেন অনুতপ্ত ভাব একটা—অপরাধীদের মত।

'এই যে হয়ে গেছে।'

'থাক্‌গে, চা খেয়ে আমার আর দরকার নেই। সাতটা বেজে গেছে সাড়ে ন'টার মধ্যে দুটো টিউশ্যনী সারতে হবে। একটা বাগবাজার, আর একটা বৌবাজার! কখন কি করি বলো ত? তাও বৌবাজারেরটা একেবারে নতুন।'

'লক্ষ্মীটি, তৈরী চা একটু মুখে দিয়ে যাও। আর কখনও হবে না। মাথা খাও আমার। এক মিনিট, তুমি টোস্ট্ খাও, আমি পিরিচে চা ঢেলে দিচ্চি।'

পিছু পিছু প্রায় বাইরের দরজা পর্যন্ত যায় অরুণা। বিজয় কোন মতে আধখানা টোষ্ট কামড়ে আগুনের মত চা গিলে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে বেরিয়ে যায়।

সেইটুকুতেই কী তৃপ্তি অরুণার চোখে-মুখে।

অবাক্ হয়ে তাকিয়ে থাকে নির্মল। আর তাকিয়ে থাকে পারুলের দিকেও।

পরের ঘরে এসে সেধে কাজ করে দিচ্ছে। কিন্তু মুখের মিষ্টি হাসি ত মিলোয় না। হাসে যে সব সময় তা নয়, তবে কথায় কথায় হাসে, আর হাসির রেশটুকু লেগে থাকে দুটি ঠোঁটের প্রান্তে বহুক্ষণ। যেমন লেগে আছে প্রভাতের কোন কঠিন পরিশ্রমের চিহ্ন-স্বরূপ স্বেদবিন্দুর দুটি একটি ফোঁটা ওর ললাটের দুই প্রান্তে, দু-এক গাছি চুলের সঙ্গে জড়িয়ে।

সুন্দরী মেয়ে অনেক দেখেছে নির্মল, দেশে-বিদেশে ঢের। পার্শী, গুজরাটি, কাশ্মীরী কিছুই বাদ যায় নি। তার ঘরেই ত অসামান্য সুন্দরী মেয়ে ছিল। না, পারুল সুন্দরী নয়, হয়ত এমন কিছু সুশ্রীও নয়। তবু কী যেন আছে ওর মধ্যে, তাজা সরসতা—কুঁড়ির মত একটা সতেজ সবুজ নমনীয়তা—যাতে মুগ্ধ না হয়ে পারে না। ওর গালে রুজ নেই, ঠোঁটে রং নেই—নখগুলো স্বাভাবিক শুভ্র—নেই এমন কি সামান্য একটু পাউডার কি স্নো—প্রসাধনের তো বালাই-ই নেই। নির্মল মনকে প্রবোধ দেয়—অনভ্যস্ত বলে সাধারণ জিনিসও অসাধারণ লাগছে। খেতে অনভ্যস্ত ধনী ব্যক্তির মুড়ি খাওয়ার মত।

'এ মেয়েটি কে রে অরু—? তোদের কোন আত্মীয়?' চা খেতে খেতে প্রসন্ন স্নিগ্ধকণ্ঠে প্রশ্ন করে নির্মল।

অরুণা একটু হেসে পারুলের দিকে তাকিয়ে বললে, 'না দাদা। তাহলে কি আর দিদি বলত? শ্বশুর বাড়ীর সম্পর্ক হলে বৌদি বলার কথা। ও আমার এখানেই কুড়িয়ে পাওয়া বোন একটি। ঐ ভেতর দিকের দুটো ঘরে ওরা ভাড়া থাকে।'

'বা। দিব্যি মেয়ে!...চেহারার মধ্যেও বেশ একটা চটক আছে।'

সাধারণ প্রশংসার কথা। অনেক বেশী বয়সের কেউ যে ধরণের প্রশংসা করলে অপত্য-স্নেহের আভাস বাজে—কথাগুলো সেই ধরণেরই। কিন্তু নির্মলের দৃষ্টিতে কি যেন ছিল একটা, পারুল শুধু লাল হয়েই উঠল না, কেমন একটা অস্বস্তি বোধ ক'রে পালিয়ে গেল ঘর থেকে।

কুটনো কুটতে কুটতে অরুণা অত লক্ষ্য করলে না। স্বাভাবিক লজ্জা মনে ক'রেই তার কণ্ঠস্বর আরও স্নিগ্ধ হয়ে এল। সে

বললে, 'ছাখো না। ওর বাপ ভালই রোজগার করে, কিন্তু মদ খেয়ে যথাসর্বস্ব উড়িয়ে দেয়—এক পয়সা থাকে না, উল্‌টে ধার। এত বড় মেয়ে, বিয়ের কথা ত ভাবেই না—একগাছা চুড়িও গড়িয়ে দিতে পারে না। দেখলে ত কাচের চুড়ি পরে আছে।'

'তোর যেমন কথা। ঐটুকু মেয়ের বিয়ের ভাবনা ভাববে কি!'

'অতটুকু নয় দাদা। বিয়ে না দিলে লেখাপড়া শেখাতে হয়।...দুটোর কোনটাই নেই, ও কী নিয়ে থাকে বলো ত।'

নির্মল আর উত্তর দিলে না।

অরুণা দ্রুতহস্তে রান্নার জোগাড় করে নেয়। দাদা তার এই ব্যস্ততার দিকে তাকিয়ে আছেন এটা অনুভব ক'রে সে কৈফিয়ৎ দেয়, 'উনি ফেরেন ঠিক পনেরোটি মিনিট সময় হাতে নিয়ে, ঘামটা মরবারও সময় থাকে না। তারই মধ্যে নাওয়া খাওয়া—আবার কাপড় জামা পরে বেরোনো। কী তাড়া যে হয়—'

নির্মল কথা কয় না। অন্তরে অন্তরে একটা অকারণ জ্বালা অনুভব করতে থাকে কেন কে জানে! এটা বাড়াবাড়ি, ন্যাকামি—এই বলে যতই সে মনে মনে সান্ত্বনা পাবার চেষ্টা করুক—পায় না।

বিজয় বাড়ী ফেরে অনেক দেরি করেই। ছাত্রের বাড়ী দেরি হয়েছে কিন্তু সেটার অপরাধ চাপায় চা দিতে দেরি করার জন্যে অরুণার ওপরই। অকারণে যেন বড় বেশি খিট্‌ খিট্‌ করে। অরুণা কিন্তু তার উত্তরে একটিও জবাব দেয় না, বরং বিনীত ভাবে

সব বোঝটাই মাথা পেতে নেয়। স্নান করার সময় হয় না, বিজয় কোনমতে দুটি ভাত মুখে গুঁজেই বেরিয়ে পড়ে।

নির্মলের গা জ্বালা করে এই বাড়াবাড়িতে। সে বেশ একটু অবজ্ঞার সুরেই বলে, 'এ ত তোমার সরকারী চাক্‌রী নয় হে! করো ত ইস্কুল মাস্টারী, দু পাঁচ মিনিট দেরি হলেই বা কি?'

বিজয় খেতে খেতেই জবাব দেয়, 'সরকারী চাকরীও কোন দিন করেন নি—ইস্কুল মাষ্টারী ত নয়ই। সরকারী চাকরীতে একবার ঢুকলে আর তা বড় একটা যায় না। কিন্তু ইস্কুল মাষ্টারী থাকে কমিটির দয়ার ওপর—হেড মাষ্টার কানে কানে বলবেন, তাঁরাও বরখাস্তনামায় সই করবেন। ব্যস!...তা ছাড়া প্রথম পিরিয়ডে ক্লাস টেন-এ পড়াতে হয়। দেরী হওয়াটা বাঞ্ছনীয়ও নয়। আমার একটা দায়িত্ব আছে ত!'

আঁচিয়ে মুখ না মুছেই দৌড়োয় সে। অরুণা সমস্তক্ষণ খুঁৎ খুঁৎ করতে থাকে, 'স্নান না করে গেলেন। মাথায় জল না পড়লেই ওঁর মাথা ধরে। জানি ত ওঁকে—আর সে যা ভীষণ মাথাধরা! কী হবে কে জানে!'

নির্মলের আর সহ্য হয় না। সে বলে, 'তোর যেন বড্ড বাড়াবাড়ি অরু। তোরা দুজনেই সমান। অকারণে তোর ওপর সে খানিক ঝাল ঝাড়লে। আড়াই ঘণ্টা টিউশ্যনীর মধ্যে এক কাপ চা দিতে একটি মিনিট দেরি হলে কী মহাভারত অশুদ্ধ হয়? ছেলে পড়ানো হাতের মধ্যে। একটু কম পড়ালে কী ক্ষতি হ'ত? তার জন্যে যাই বলিস বাপু তোর ওপর এই রাগারাগি করাটা ওর উচিত হয়নি।...ঐ জন্যেই লোকে বিয়ে দিতে গেলে সমান ঘর

খোঁজে। তুই কোন্ বংশের মেয়ে, কীভাবে মানুষ হয়েছিস সেটা ওর খেয়ালই থাকে না। তোর মর্যাদা ও কি বুঝবে বল। তুই যা করছিস তাতেই ওর কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। এসব কি তোর করবার কথা। আর ও কি?…আমাদের কথা না শুনে তখন যা ভুল করেছিস….এখন হাড়ে হাড়ে বুঝছিস ত। এই সব ভেবেই আমরা তখন নিষেধ করেছিলুম। হাজার হোক ও হ'ল আমলার ছেলে! বানরে মুক্তোমালার দাম কী বুঝবে?'

অরুণার বিরক্তিও আর চাপা থাকে না, 'কী যে বলো দাদা তার ঠিক নেই। যে ভুল করেছি সেই ভুলই জন্মজন্মান্তর করতে রাজী আছি। ও সব কথা আমার সামনে আর বলো না কোন দিন।'

বিজয় যত বিরক্তই হোক—সম্বন্ধীর জন্য ভোজের আয়োজন করেছিল ভালই। দিনের বেলায় দুরকম মাছ ছিল, সন্ধ্যা বেলায় সত্যিসত্যিই খানিকটা মাটন নিয়ে এল। ঘিয়ের ব্যবস্থাও ক'রে গিয়েছিল—যাতে মাটনের সঙ্গে লুচির যোগাযোগ করা যায়।

রাত্রে এক সঙ্গে খেতে বসে সকলে। পরিপূর্ণ তৃপ্তির সঙ্গে খেতে খেতে আরামে প্রায় চোখ বুজে আসে নির্মলের। লুচির গ্রাসে-ঠাসা-মুখে রুদ্ধ-কণ্ঠে বলে, 'তুই এমন রাঁধতে শিখলি কবে রে অরু? বাবুর্চিকে হার মানিয়ে দিয়েছিস যে। ওখানে থাকতে ত কোনদিন রান্নাঘরে যাসনি।'

'কাজ করতে করতেই শিখে নেওয়া যায় দাদা। রান্নাটা বিশেষ করে একটু মন দিলেই ভাল করা যায়। আমার ত মন না দিয়ে উপায় নেই। একে ত বাজারে হোটেলে খান না কখনও,

তার ওপর গরীবের সংসার, খেলেই বা জোগানো যায় কোথা থেকে? কাজেই ভাল খাবার আমাকেই তৈরী করতে হয় মধ্যে মধ্যে—নইলে ত ওঁর খাওয়াই হবে না!'

ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে ওঠে নির্মলের। সবই 'ওঁর' জন্যে। আদিখ্যেতা শব্দটি ওদের বাড়ীর ঝিয়েরা মধ্যে মধ্যে ব্যবহার করত—এতদিনে তার প্রয়োগটা বুঝতে পারে নির্মল।

কিন্তু বেশী কিছু আর বলতেও হয় না। একটা আকস্মিক তীব্র আর্তনাদ শুধু সেই জরাজীর্ণ বাড়ীটাই নয়—সমস্ত নিস্তব্ধ পাড়াটাকে যেন সচকিত করে তুললে। যেন মনে হ'ল সেই নিশীথ-রাত্রির স্তব্ধতাকে চিরে খান খান করে দিয়ে গেল।

আবার একটা—আরও তীব্র। আরও একবার।

বিজয় আর অরুণা পরস্পরের দিকে তাকায় শুধু নিঃশব্দে একবার। ওদের আহারের ব্যাঘাত ঘটে না।

কিন্তু নির্মল আড়ষ্ট হয়ে যায়।

'কী ও অরু? কে অমন ক'রে চেঁচাচ্ছে রে? কারুর কলিক পেন উঠল নাকি?'

'কলিক পেনে অমন ক'রে কি চেঁচায় দাদা—বিশেষতঃ এ পাড়ায়? সবাই যেখানে দরিদ্র, নয় নিম্ন মধ্যবিত্ত। একটু আধটু যন্ত্রণা মুখবুজে সহ্য করাটা অভ্যাস হয়ে যায়। ও সে সব কিছু নয়, পারুলের বাবা মদ খেয়ে এসে ওর মাকে ঠ্যাঙাচ্ছে। ওটা এখানে প্রায় নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা! কাল ওর বাবা ছিল না তাই। বাইরে বাইরে চাকরী কিনা—বিদেশেও যেতে হয় মধ্যে মধ্যে। সব দিন থাকে না এই রক্ষে।'

'বলিস কি? ভদ্রলোকের পাড়ায় এই কাণ্ড? কী জাত ওরা?'

'জাত ভালই—ব্রাহ্মণ। কিন্তু উপায় কি বলো। এমনি মানুষটা খুব ভাল, স্ত্রীকে খুব ভালও বাসে, কিন্তু এক ঢোঁক পেটে পড়লেই আর জ্ঞান থাকে না।'

'তা তোরা পাঁচজনে ত একটু শাসন করতে পারিস। আমি যদি এ পাড়ার বাসিন্দে হতুম ত হর্স-হুইপ করতুম ওকে। যেমন জানোয়ার তেমন ব্যবস্থা!'

'হ্যাঁ—যাও না একবার। দেখবে যে ওর ঐ স্ত্রীই তখন বাঘিনীর মত তেড়ে আসবে তোমাকে।'

নির্মল কি বলতে যাচ্ছিল—আবারও একটা আর্তনাদ উঠল। এবার তীব্রতর। প্রহারের শব্দটাও বেশ স্পষ্ট। ওপর থেকে কে একজন ধমক দিয়ে উঠল, 'ও কী হচ্ছে ঘোষাল? ঘা-কতক খাবে আমাদের হাতে?'

পারুল সবেগে এসে ঢুকল ওদের ঘরে। তার দুই চোখে জল না থাকলেও রোদনে আরক্ত হয়ে উঠেছে—প্রায় কান্নার সুরেই বললে, 'বিজয়দা, আজ বড্ড বাড়াবাড়ি শুরু করেছেন বাবা, আপনারা একবার যান। নইলে বোধ হয় মা মরেই যাবেন মার খেয়ে।'

বিজয় আর অরুণা দুজনেই ছুটে গেল। খাওয়া শেষও হয়ে এসেছিল ওদের। নির্মলও উঠে পড়ল। পারুলের দিকে তাকিয়ে বললে, 'ইস কী কাণ্ড! ব্রুট!'

তারপর কাছে এগিয়ে এসে পারুলের কাঁধে বাঁ হাতখানা রেখে বললে, 'তুমি, তুমি বরং ঐ বিছানায় গিয়ে বসো। একটু বিশ্রাম করো—'

পারুল কাঁধটা ছাড়িয়ে নিয়ে বললে, 'ঠিক আছে।' দৃষ্টিতে তার দুঃখের মধ্যেও বিরক্তি ফুটে উঠল।

অরুণা পারুলের মাকে টেনে ঘরের মধ্যে নিয়ে এল। নিতান্ত সাধারণ চেহারার মধ্যবয়সী স্ত্রীলোক। পরিশ্রমে ও পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে শীর্ণ শ্রীহীন।

কতখানি অমানুষ হলে এই দেহে আঘাত করতে পারে মানুষ। তিনচার জায়গায় কালশিটে দাগ পড়েছে ইতিমধ্যেই। কপালের এক জায়গায় কেটেও গেছে খানিকটা—

অরুণা রক্ত মুছিয়ে টিংচার আইডিন দিয়ে দিলে, তারপর জোর করে একটা আসনে বসিয়ে হাওয়া করতে লাগল। ভদ্রমহিলা নিঃশব্দে কাঁদছিলেন কিন্তু সেদিকে তাকিয়ে নির্মলের মনে হ'ল সেটা নিতান্তই বেদনায়—অপমানে নয়।

ওধারে কে যেন, বোধকরি বাড়ীওলারাই কেউ, নেমে এসে জোর করে ধরে দু বালতি জল পারুলের বাপের মাথার ঢেলে দিলে, প্রথমটা খুব তম্বী এবং গালাগাল্লি চলেছিল কিন্তু তারপরেই হঠাৎ সব শুব্ধ হয়ে গেল। জল ঢালার সঙ্গে সঙ্গে যেন আগুনটা নিভে গেল।

অরুণা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললে, 'ব্যস বাবা। এবার নিশ্চিন্তি। পাঁচ মিনিট আর!'

নির্মল কথাটা ঠিক বুঝতে না পেরে ওর মুখের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। ঈষৎ হাসির রেখা মুখে ফুটে উঠল অরুণার, সে জবাব দিলে, 'ছাখোই না পাঁচটা মিনিট, নতুন নাটক অভিনয় শুরু হবে আবার।'

পারুলের মা ফিস্ ফিস করে বললেন অরুণাকে, 'আর ওর ন্যাকামিতে ভুলছিনা মা অরুণা, আজ রাতটা আমাকে এখানে একটু ঠাঁই দাও—কাল সকালেই মেয়ের হাত ধরে একদিক পানে চলে যাবো। বামুনের মেয়ে—রাঁধুনীগিরি করেও ত খেতে পারব!'

খুব ভালোমানুষের মত মুখ করে বললে অরুণা, 'বেশ ত কাকীমা, থাকুন না।' কিন্তু বিদ্রূপটা তার দৃষ্টিতে চাপা রইল না।

ঠিক পাঁচটি মিনিট পরে বাইরে থেকে একটা ডাক শোনা গেল, 'সেজ বউ!'

অত্যন্ত নিরীহ, অনুতপ্ত কণ্ঠস্বর। কিছুক্ষণ পূর্বের সে তর্জনগর্জনের চিহ্নমাত্রও নেই।

বলা বাহুল্য এ ঘরের কেউ সাড়া দিলে না।

আবারও ডাক এল, 'সেজ বউ!'

'ওকে ন্যাকামী করতে বারণ করে দে পারুল। এটা ভদ্রলোকের ঘর—এখানে ওর চেঁচামেচি করার কোন এক্তিয়ার নেই।' চাপা ক্রুদ্ধকণ্ঠে বললেন পারুলের মা।

'সেজ বউ!'

অরুণা বলে, 'আপনি যান না কাকীমা। জানেন ত, সারারাত ঐ চলবে এখন! আপনাকে না দেখলে শান্তি হবে না।'

'শান্তি হবে আমি মলে মা একেবারে। হাড় খাবে মাস খাবে চামড়া দিয়ে ডুগডুগি বাজাবে।'

'সেজ বউ!'

তীর বেগে উঠে দাঁড়িয়ে বাইরে যান পারুলের মা, 'তোমার কি ঘেন্নাপিত্তি কিছু নেই! মাষ্টার মশাই বিশিষ্ট ভদ্দর লোক, তাঁর ঘরে এসে মাৎলামি করতে এতটুকু লজ্জা হচ্ছে না!'

হঠাৎ ভদ্রলোক ডুকরে কেঁদে উঠলেন, 'ওহো হো, সেজ বউ তুমি স্বর্গের দেবী—আমি নরকের কীট, আমি পিশাচ। আমি তোমার উপযুক্ত নই, সেজ বউ! আমাকে তুমি মাপ করো, আমাকে তুমি শাস্তি দাও। আমাকে তুমি লাথি মারো সেজ বউ, তোমার দুটি পায়ে পড়ি।'

'কী হচ্ছে কি! তুমি ত ঐ ছাইভস্ম খেয়ে মনুষ্যত্ব হারিয়েছ, কিন্তু আমি যে লজ্জায় মরে যাচ্ছি।'

'সেজ বউ, এইবারটি। আজকের দিনটি শুধু মাপ করো। এই এই—'

নিজের গালে কপালে ভদ্রলোক নিজেই চড় মারতে থাকেন।

'যাও, যাও বলছি ঘরে।' এবার রীতিমত আদেশের সুর কণ্ঠে।

'তবে তুমিও চল সেজ বউ। জানো ত শূন্য ঘরে একা আমি ফিরব না।'

'জ্বালাতন করলে দেখছি! চলো—জানি ত গলায় দড়ি না দিলে আমার আর মুক্তির পথ নেই!'

ওঁরা সবাই চলে গেলেন। একটু পরেই পারুলও একটা নিঃশ্বাস ফেলে তাঁদের অনুসরণ করলে। আবার সব চুপচাপ। অখণ্ড শান্তি ও নিস্তব্ধতা।

অরুণা নির্মলের দিকে চেয়ে বললে, 'ব্যাস, এইবার সত্যিই নেশা ছুটবে। তারপর আগুন জ্বেলে তার্পিন তেল দিয়ে স্ত্রীর ব্যথার জায়গা মালিস হবে, সেঁক দেবেন। নিজে নিজে কান-মলা খাবেন, মায় রাত একটার সময় চুপিচুপি বাইরে বেরিয়ে রসগোল্লা কিনে এনে খাওয়াবেন। তারও পরে স্ত্রী ওঁকে যত্ন করে খাওয়াবে, মাথায় বাতাস করে ঘুম পাড়াবে। এমনি প্রত্যহ।'

'বলিস কি?'

'আমাদের দেখে দেখে মুখস্থ হয়ে গেছে দাদা।'

সেদিন আর অরুণা ঘরে বিছানা করার ভানও করলে না—সোজাসুজি সঙ্কীর্ণ চলনে সঙ্কীর্ণতর শয্যাতেই শুতে গেল। সলজ্জভাবে দাদার দিকে চেয়ে বললে, 'একা শোয়া অভ্যাস নেইত, কেমন যেন লাগে।'

একটানা একটা গুঞ্জন—খুব মৃদু হলেও নিঃসন্দেহ ওদের গল্প করার শব্দই—কানে এসে পৌছয়। অনেকক্ষণ পরে যেন ছট্‌ফট করে উঠে পড়ে নির্মল, বাথরুম যাবার অছিলায় বাইরে বেরিয়ে এসে দেখে তখনও অরুণা বসে বসে স্বামীর পা টিপেদিচ্ছে।

৩

কোথায় যেন নির্মলের মাথার মধ্যে কি গোলমাল হয়ে যায়। কিছুতেই একটা কি হিসেব মেলাতে পারে না। অভ্যস্ত জীবনের অভিজ্ঞতায় মনে মনে মানুষের যে হিসেবটা গড়ে উঠেছিল সেইটাই যেন ওলট-পালট হয়ে গেছে। ওর মনের জগতে কোথায় একটা বড় রকমের বিপ্লব ঘটেছে—জীবনের কাব্যে ঘটেছে ছন্দ-পতন।

ঘুমোতে ত পারেই না, শুয়ে থাকাও যেন অসহ্য বোধ হয়। অবশেষে সোজাসুজি উঠেই বসে নির্মল।

মানুষ মানুষকে কেন এত ভালবাসে—কী পেয়ে তারা এমন কৃতার্থ—এ হিসেবটা কিছুতেই বুঝতে পারে না নির্মল। জীবনকে সে দেখেছে চিরকাল দেনাপাওনার মধ্যে দিয়েই। আজ হঠাৎ দেখছে মানুষের মন চলে জমাখরচের বাইরের কোন পথ দিয়ে।

আচ্ছা অমলাও কি তাকে ঐ রকম ভাল-বাসত? অমনি ভালবাসা কি সম্ভব?

হয়ত বাসত। কোনদিন ত নির্মল সেটা নিয়ে মাথা ঘামায় নি। এসব কথা তখন জানতও না। অর্থ দিয়ে দেহ কিনেছে—কেনা-বেচার হিসেবটা বোঝে—মনের খবর জানবার চেষ্টাও করেনি কখনও। তখনকার মত ধরেই নিয়েছে যে মনটাও তার। হীরকালঙ্কারের দ্যুতিতে মুখে যে হাসি উদ্ভাসিত হয়েছে সেই হাসিকেই সে ধরে নিয়েছে ভালবাসার প্রকাশ। যখন অর্থ থাকেনি তখন সহজেই মেনে নিয়েছে যে তার আর কোন দাবী নেই—ওপথে যায় নি। অনেক খেলা জীবনে খেলেছে—খেলার সুখেই মগ্ন ছিল সে।

কিন্তু খেলা কি সে-ই খেলেছে?

অকস্মাৎ নির্মলের কপালটা ঘেমে ওঠে কেন? কী একটা অসহ্য অস্বস্তিতে ছটফট করে ওঠে। এতদিন নিশ্চিন্ত ছিল, আত্মতৃপ্তিতে ছিল অন্ধ হয়ে। আজ প্রথম সংশয় জেগেছে মনে। খেলা কি তাকে নিয়েই খেলে নি ওরা?

মিষ্টি হেসে, মিষ্টি কথা বলে, অভিমান জানিয়ে নিত্য নূতনতর উপহার আদায় করেছে তারা। তখন নির্মল বুঝতেও পারেনি যে তারা আদায় করছে—ভেবেছে ও নিজেই দিচ্ছে। রোজ

নূতন নূতন উপহার দিয়ে নূতন নূতন কৃতজ্ঞতা পেয়েছে। তাদের উজ্জ্বল চোখে যে বিস্ময় ও শ্রদ্ধা—শ্রদ্ধা মনে করেছে তখন অন্তত--ফুটে উঠত, তার মধ্যে নির্মল পেত নিঃশব্দ পূজা। সেই পূজায় ওর পৌরুষ চরিতার্থ হত, নেশা লাগ্‌ত মনে। নেশায় মেতে উঠেছিল তাই—নিত্য নূতন উপচারে সেই মৌতাতকে সদা জাগ্রত রাখত।

এমন কি যখন কোন সম্বল আর রইল না তখনও সে-খেলা শেষ করতে চায়নি সে। তাইত অমলাকে—

অমলা—

হয়ত অমলাই একমাত্র তাকে ভালবেসেছিল। কিন্তু সেদিকে ত কোন দিন তাকায়নি নির্মল। স্বাভাবিক ভাবে প্রাপ্য বলে গ্রহণ করেছে সে ওর আচরণ। কোন দিন ওকে খুশী করবার চেষ্টা করেনি। সম্পত্তি যা নিরাপদ আছে আয়ত্তের মধ্যে, তার সম্বন্ধে মানুষের যা মনোভাব হয়, কতকটা সেই মনোভাবই ছিল নির্মলের—স্ত্রী সম্বন্ধে।

অতি সহজে সে তাই ব্যবহার করেছে স্ত্রীকে। অমলার মনে কি প্রতিক্রিয়া হতে পারে তা একবারও ভেবে দেখে নি। অপমানে বিবর্ণ হয়ে উঠেছে তার মুখ—দৃষ্টিতে ফুটে উঠেছে চরম অসহায়তা—কিন্তু প্রতিবাদ সে করেনি। আগে নির্মল দিত ইঙ্গিত, ইদানীং লজ্জা ভেঙ্গে গিয়েছিল, সোজাসুজিই নির্দেশ দিত স্ত্রীকে। শেষের দিকে অমলা ওর সঙ্গে কথা কওয়াই ছেড়ে দিয়েছিল, অবশ্য তাতে নির্মলের কোন ক্ষতিবৃদ্ধি হত না। সে শুধু দেখত ওর শিকারের ব্যাঙ্ক-ব্যালেন্স এবং পকেটে টাকার অঙ্কটা। অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করত কখন তাদের

চোখে নেশার ঘোর ঘনিয়ে আসবে—কখন তার 'ধার চাওয়া' টাকাটা তারা এগিয়ে দিতে আসবে সাগ্রহে। একবার মাত্র অমলা প্রতিবাদ করেছিল। বোম্বের কেবলরাম শেঠকে যেদিন চায়ে নিমন্ত্রণ করেছিল নির্মল—সেই দিন। সজল চোখে ওর দিকে তাকিয়ে বলেছিল—অসহায় আকুল একটা আর্তি ফুটে উঠেছিল সে সময় ওর কণ্ঠে, বলেছিল—'আর কত নীচে নামাতে চাও আমাকে, আর কত নাম্‌ব? দোহাই তোমার, এবার আমাকে অব্যাহতি দাও!'

অব্যাহতি দিতে পারেনি নির্মল। তিন-চারটে খুব কড়া তাগাদা, হোটেলের মোটা বিল এবং ব্যাঙ্কের খাতায় একান্ত শূন্যতা—তাকে অব্যাহতি দিতে দেয়নি। ঐ কেবলরামের কাছে টাকা না পেলে পরের দিন হয়ত বে-ইজ্জৎ হতে হত! সে বলেছিল, 'শুধু ত সেজেগুজে সামনে বসে থাকা আর দুটো মিষ্টি কথা বলা। কী একটু মিষ্টি হাসি হাসা। এতে তোমার এতই কি অপমান হয় আর নিচে নাম্‌তে হয় তা-ত বুঝি না!' বরং যেন একটু বিরক্তই হয়ে উঠেছিল ও অমলার এই অকারণ নাকি-কান্নায়। সে বিরক্তি কণ্ঠে ফুটেও ছিল হয়ত।

অমলা সেদিনও ওকে হতাশ করেনি, কিন্তু তার পরেই ত আত্মহত্যা করল!

উঠে না দাঁড়িয়ে পারল না নির্মল। যেন কে তাকে চাবুক মেরে তুলে দিল তাকে। সিগারেট ধরাতে গিয়ে হাত কেঁপে

গেল, পারলে না কিছুতেই ধরাতে। বাতাস যেন ঘরে নেই—ভাল একটু ঠাণ্ডা বাতাস।

ছুটে গিয়ে গলির দিকের জানলাটা খুলে দিতেই ভিজে স্যাঁৎসেতে লোনা-ধরা দেওয়ালের ভ্যাপসা গন্ধ নাকে এল, তার সঙ্গে নানা আবর্জ্জনার গন্ধ। তাড়াতাড়ি বন্ধ করে দিলে সেটা তখনই। অন্ধকারে খানিকটা ঘরের মাঝখানে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে আবার এসে ধপ্ করে বসে পড়ল বিছানাতেই।

কিন্তু—কিন্তু তাতে কী সুখ পেয়েছে নির্মল? দেশে-দেশে ঘুরেছে, নানা উদ্ভট ব্যবসা করার চেষ্টা করেছে, দু' একটা ফেঁদে নষ্ট হয়েছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে সে-সব ব্যবসায় নামাই হয়ে ওঠে নি। অথচ এই সব টাকা জোগাড় করতে কী বেগই না পেতে হয়েছে। কোথাও বেশি ভাড়া দিয়ে প্রকাণ্ড বাড়ী ভাড়া করতে হয়েছে, ভাড়া করতে হয়েছে ফার্নিচার, চাকর-বাকর রেখে নিজের অবস্থা যে ভাল সেটার প্রমাণ দিতে হয়েছে। এত কাণ্ড করে যে টাকা পাওয়া গেছে তাতে এই সব বিল মিটিয়ে যেটুকু অবশিষ্ট থেকেছে আর কোথাও গিয়ে নতুন করে আসর জমাবার সূত্রপাতেই নিঃশেষ হয়ে গেছে সব। কোথাও বা গিয়ে উঠতে হয়েছে দামী হোটেলে, তিন মাসের চেষ্টায় দশহাজার টাকা হস্তগত হওয়ার পর দেখেছে হোটেলের বিল মিটিয়ে আর কিছু দিন অপেক্ষা করার আর ভরসা পাওয়া যায় না—অন্যত্র ফার্স্ট ক্লাস ট্রেন ভাড়া দিয়ে গিয়ে এক সপ্তাহের টাকা য়্যাডভান্স করতেই—যা থাকে তা শেষ হয়ে যাবে। এই ভাবেই ত কেটেছে শেষ দু-তিনটে বছর!

স্বচ্ছন্দে থেকেছে। সুখে থেকেছে। তা ঠিক। এমন করে খোঁয়াড়ে বা গোয়ালে বদ্ধ হয়ে গরু-ঘোড়া-গাধার মত থাকতে হয়নি। দামী ঘর, ভাল আসবাব, ঝি-চাকরের সেবা, উৎকৃষ্ট খাদ্য, মূল্যবান সুরা ও সিগারেট—বিলাতী ফিল্মে দেখা বড়লোকদের মতই আরামে দিন কাটিয়েছে। অবসর সময় স্ত্রীলোকেরও অভাব হয়নি।

তবে—সে-স্বাচ্ছন্দ্য, সে-সুখ কি ঠিক ভোগ করা গেছে সে সময়? বোধ হয় না।

দুশ্চিন্তা আর অনিশ্চয়তার কণ্টক-শয্যাতেই ত অহোরাত্র কেটেছে। যে আরাম, বিলাসের যে মহার্ঘ উপকরণ তাকে ঘিরে ছিল তাকে ত সে অনুভব করারও সময় পায়নি—উপভোগ করা ত দূরের কথা। মতলবের পর মতলব ভাবতে হয়েছে—তাকে কাজে পরিণত করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টাও করতে হয়েছে, অভিনয় করে যেতে হয়েছে দিন-রাত। রাত্রে ঘুম পর্যন্ত হয়নি দুর্ভাবনায়। বিছানায় বিনিদ্র শুয়ে শুয়ে পরের দিনে বলবার মত অজস্র মিছে কথা ভেবে রেখেছে—

তার আগে?

নির্মল অবশেষে একটা সিগারেট ধরাতে পারে। কোনমতে হাতকে বশে আনে সে।

তার আগেই বা কি। পৈত্রিক অর্থ যতদিন ছিল, নানা ব্যবসায় ফেঁদেছে। সে সময় অবশ্য স্বাচ্ছন্দ্যের উপকরণ কষ্ট করে পেতে হয়নি—চারিদিক থেকে ঘিরেই ছিল—তার সঙ্গে ঘিরে ছিল অসংখ্য মোসাহেব এবং প্রসাদপ্রার্থী-প্রার্থিনীর দল। কিন্তু মন কি তাতে তৃপ্ত হয়েছে—আনন্দ? আনন্দ বলে কি কোন

কিছু অনুভব করেছে কোন দিন? যা অনায়াসে হাতের কাছে পায় মানুষ, যা তাকে আবাল্য ঘিরে থাকে—তাকে কি কেউ অনুভব বা উপভোগ করতে পারে?

যেমন, যেমন এরা অনুভব করে? ঐ অন্ধকার চলনে, ঐ সামান্য বিছানায়—কাঠখোট্টা স্বামীর পা টিপে দিতে দিতে ফিস ফিস ক'রে কথা বলে অরুণা হাসিতে ফেটে পড়ে যে আনন্দের পরিচয় দিচ্ছিল এই মাত্র, সে রকম কোন আনন্দ! বোনের সম্বন্ধে তীব্র একটা ঈর্ষা অনুভব করে যেন নির্মল।

ঈর্ষা ও বিদ্বেষ!

পরের দিন বিজয় টিউশ্যনী করতে চলে গেলে ডিমের পোচ আর চা খেতে খেতে পূর্বরাত্রির চিন্তাটারই প্রতিধ্বনি করে নির্মল, 'যাই বলিস তোরা অরু—এ জীবনের কোন মানে হয় না।'

'কী জীবন দাদা?' অরুণা অত বুঝতে পারে না।

'এই যে জীবন তোরা যাপন করছিস। গোরু, ঘোড়া ছাগলের জীবন। একটা অন্ধকার খাঁচায় বন্ধ হয়ে থাকা, উদয়াস্ত খাটুনি, মনের মিল নেই কারুর সঙ্গে—আশাহীন আনন্দহীন জীবন যাপন—এ বেঁচে থেকে লাভ কি?'

অরুণা চুপ করেই থাকে, শাক ভাঙ্গার শাক বেছে ধুয়ে থালায় তুলছিল তখন—সুক্তোটা ফুটছে, কান আছে খানিকটা সেইখানে।

নির্মল বলতে বলতে যেন আরও উত্তেজিত হয়ে ওঠে, কারণ এ যুক্তি ত ওর বাইরের কারুর কাছে নয়—এ ওর মনের

কাছেই। এক্ষেত্রে প্রতিবাদী অরুণা নয়, নিজের বিবেক বা ঐ রকম একটা কিছু মানসিক অস্তিত্ব ;—বলে, 'না না, চুপ করে থাকিসনি অরু, তুই-ই বল ঠিক করে। কত পয়সা খরচ করে তুই লেখাপড়া শিখলি, গান বাজনা ছবি-আঁকা—কী না শিখেছিস তুই! সে কি এই জন্যে? এই ঝিয়ের মত দিনরাত খাটবি বলে? এ বাড়ীতে আর যারা আছে তারা হয়ত এর বাইরে আর কিছু জানে না, কিন্তু তুই, তুই কি করে থাকিস্? পৃথিবী আজ কত এগিয়ে গেছে বল দিকি—আরাম আর স্বাচ্ছন্দ্যের হাজার উপকরণ চারদিকে, কত রকম ব্যবস্থা বেরিয়েছে এনার্জির অপচয় বাঁচাবার জন্যে। সঙ্গীত, শিল্প, সাহিত্য, জীবনের কত আনন্দের দোর খোলা চারদিকে, তার থেকে সম্পূর্ণ বিদায় নিয়ে—এ জীবনের মূল্য কি?'

'কিন্তু দাদা আসল সুখ ত মনে।' একটু যেন অসহিষ্ণু ভাবেই বলে অরুণা, 'যে ভাবে যে সুখে থাকে তাই তার ভাল। তাছাড়া তুমি ভুলে যাচ্ছ ইস্কুল-মাস্টারের বউ আমি—ওভাবে বাঁচবার কোন অধিকার আমার নেই। মানে আর্থিক অধিকার।'

'বাঁচার মত বাঁচা—দু' দিন হলেও ক্ষতি নেই। দুটো দিনও জীবনকে উপভোগ করা ভাল। এমন করে দীর্ঘদিন বেঁচেই বা লাভ কি?'

এবার অরুণার কণ্ঠও তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে। একটু খোঁচা, সামান্য একটু বিষ বেরিয়ে আসে গলার আওয়াজে, 'বাঁচার মত বাঁচতেই ত তুমি গিয়েছিলে দাদা। কিন্তু তারপর? এখন দাঁড়াবে কোথায়। আমাদের মত গোরু-ঘোড়া-ছাগল ছিল বলেই ত তবু এসে একবেলা দাঁড়াতে পেরেছ। জীবনে কতকগুলো আছে প্রয়োজন—

সেটার সংখ্যা খুব কম দাদা। বাকী যা তা সবই বিলাস, তার ত শেষ নেই। কামনার কি শেষ আছে? উনি বলেন হাউই খুব জ্বলে নিমেষের জন্যে, তাতে যারা দেখে তাদের চোখ ধেঁধে যায়। কিন্তু তারপর? সে যতক্ষণ জ্বলে ততক্ষণই বা তার নিজের কি তৃপ্তি, শুধু দহন ত? বাকী যা—সে ত শুধু ছাই।'

নির্মল রাগ করে চায়ের কাপটা নামিয়ে রাখে ঠক্ করে, 'তোদের কাছে দুদিন এসেছি তাই তুই খোঁটা দিচ্ছিস! বেশ আমি আজই চলে যাচ্ছি—'

'ছি দাদা। তোমাকে রাখতে যদি পারি, দুটো দিনও যদি এখানে থেকে শান্তি পাও, সে ত আমাদের সৌভাগ্য। কিন্তু তুমি এসে পর্যন্ত আমার স্বামীর দারিদ্র্য নিয়ে ইঙ্গিত করছ—সেটা কি ভাল? তোমাকে যখন তারই অতিথি হতে হয়েছে!'

নির্মল হয়ত আরও কি বলত, হঠাৎ ঘরে এসে ঢুকলেন পারুলের মা, হাতে একটা শাল-পাতার বড় ঠোঙ্গা।

'ও কি কাকীমা?'

'ছাখ্ মা তোর কাকার কাণ্ড! আমি নাকি কবে বলেছিলুম গরম জিলিপি খেতে ইচ্ছে করে, আজ একেবারে নিজে গিয়ে ভাজিয়ে নিয়ে এসেছে এক টাকার জিলিপি! এত কে খাবে মা? পারুল বললে, 'তুমি বরং খানকতক দিদিকে দিয়ে এসো গে। নে মা, ধর এই ক' খানা।'

অরুণা তাড়াতাড়ি উঠে খান চারেক জিলিপি নেয় ওঁর হাত থেকে। পারুলের মা কিন্তু জোর করে আরও দুখানা গুঁজে দেন ওর হাতে। নির্মল লক্ষ্য করে যে নববধূর মত সুখে ও লজ্জায়

টলটল করছেন ভদ্রমহিলা। শীর্ণ কুঞ্চিত কপোলেও অপরূপ রক্তিমা ফুটে উঠেছে—

পারুলের মা চলে যেতে সে বোনের সঙ্গে বিবাদ ভুলে গিয়ে বলে উঠল, 'কাল যে লোকটা অমনি করে পশুর মত ঠ্যাঙ্গালে, একবাড়ী লোকের সামনে কেলেঙ্কারী—আজ তারই সোহাগ নিয়ে আদিখ্যেতা করে বেড়াতে লজ্জা করে না ওর! অশিক্ষিত মেয়েমানুষ সব! আত্মসম্মান জ্ঞান বলে যে কোন জিনিস আছে তাই ওরা জানে না। কিন্তু তুই বা কি বলে ঐ সব ছাইভস্ম হাত পেতে নিলি। ভেজিটেবল ঘিয়ে ভাজা থার্ড ক্লাস দোকানের খাবার সব!'

'ওমা! তা নেব না? অত আনন্দ করে দিতে এলেন উনি। আর এসব খাবার যে খাই না আমি তা ত নয়!'

তার পরই একখানা জিলিপিতে কামড় দিয়ে বললে অরুণা, 'বেশ গরম আর মচমচে। খাবে একখানা দাদা?'

'রক্ষে কর। ওসব হ্যাপ্তি জিনিস ছুঁতেও পারব না।'

৪

পারুল কী এক অদ্ভুত আকর্ষণে টানে নির্মলকে। মনে মনে যতই সে বলে যে এই অর্ধবর্বর পরিবেশে মানুষ অশিক্ষিতা মেয়ে তার একবারের দৃষ্টিপাতেরও যোগ্য নয়, ততই তার দৃষ্টি লালায়িত হয়ে ফেরে তার স্নান করার পর এলানো কুন্তলে, তার আধময়লা শাড়ীর আঁচলে এবং ললাট-প্রান্তের স্বেদরেখায়। মুখের হাসির

দিকেও তাকিয়ে থাকে বৈকি। কিন্তু পারুল স্পষ্টই বিরক্ত হয় ওর এই লোলুপ নির্লজ্জতায়। এখানে আসাই সে কমিয়ে দিতে থাকে।

নির্মল আহত হয়। এতদিন সে দেখেছে তার প্রসাদ পেলে মেয়েদের কৃতার্থ বোধ করতে। এই কালো শ্রীহীন মেয়েটার এত দম্ভ! নিজের ত ঐ অবস্থা—মাতাল বাপের হাতে মার খায়, হাতে কাচের চুড়ি ভরসা—নির্মল কি সত্যই ভিখিরী! আজও সে তেমন চেষ্টা করলে এই কলকাতা শহরে বসেই এত টাকা ধার করতে পারে যাতে ওদের মত পরিবারের দশবছর চলে যাবে। নেহাৎ একেবারে অবলম্বন শূন্য হয়ে পড়েছে তাই। থাকত একখানা গাড়ী এদের এবং বাইরে লোকজন এনে বসাবার মত একখানা বৈঠকখানা, কিংবা নিদেন কলকাতার অভিজাত হোটেলে গিয়ে মদ খাওয়ার মত অর্থ—দেখে নিত নির্মল টাকা আসে কিনা।

কিন্তু সে সুযোগ কৈ?

অথচ পারুলকে বশ করতে গেলে টাকার দরকার। অন্তত নির্মলের তাই বিশ্বাস।

সে কেবলই কথাটা ভাবে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের চেহারাটাও দেখে। এককালে খুবই রূপবান্ ছিল সে—সেজন্যও ইতিপূর্বে বহু স্ত্রীলোক আকৃষ্ট হয়েছে তার দিকে। কিন্তু আজ আর সেদিন নেই। মাথার সামনে টাক দেখা দিয়েছে। ভুঁড়ি নেমেছে বেশি চামড়া কুঁচকে গেছে মুখের। বহু অত্যাচারের চিহ্ন সুস্পষ্ট। তবু মদ সে বেশি খায়নি কোন দিনই। নেহাৎ

দলে পড়ে একটু আধটু। তবু—দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনা ত কম ভোগ করতে হয়নি। অধিকাংশ দিনই ঘুমোতে পারত না।

না। রূপ যৌবন—কোনটাই নেই। অথচ পারুলকে তার চাই-ই। ভোলাতে হবে অর্থ দিয়েই। শাড়ী আর গহনা—এতে ভোলেনা এমন মেয়ে ত সে দেখেনি আজ পর্যন্ত!

অর্থাৎ টাকা চাই কিছু।

ক্রমাগত ভাবে নির্মল, দিনরাতই ভাবে। অবশেষে মনে পড়ে—এখনও একটি মূল্যবান জিনিস আছে তার কাছে। অমলার একটা হীরের আংটি। অমলা মরবার পর তার সব অলঙ্কারই একে একে বিক্রী করেছে সে—আর কীই বা ছিল—যেদিন উপহার পেয়েছে, তার কয়েকদিন পরেই তা বেচে দিয়েছে নির্মল, দিতে বাধ্য হয়েছে, কাজেই পরে থাকত যা সবই নকল জড়োয়া গহনা। শুধু অমলা কখনও বেচতে দেয়নি প্রথম বিবাহবার্ষিকে উপহার পাওয়া হীরের এই আংটিটা। নির্মলই দিয়েছিল। তখনকার দিনেই তার দাম ছিল দু'হাজার টাকা। অমলার বড় প্রিয় বলেই নির্মল সেটা বেচেনি—ওর চামড়ার ট্রাঙ্কটার তলায় আজও বোধ হয় পড়ে আছে। আজ ওর সন্দেহ হয়—সুদৃশ্য বলে নয়, পছন্দসই বলে নয়, নির্মলের প্রেমের নিদর্শন মনে করেই অমলা তা বেচতে দেয়নি।

ঐ একমাত্র সম্বল আছে।

ঐটেই বেচবে নাকি? বেচারী অমলার অত সাধের জিনিসটা?

উপায় কি? এমনিও হয়ত ওটা বেচতে হবে। চিরকাল কিছু আর অরুণার ঘাড়ে চেপে থাকা চল:ব না। হাতে ত নগদ একটি টাকাও নেই। সিগারেট পর্যন্ত বিজয় যোগাচ্ছে! সম্পূর্ণ নিঃস্ব হয়েই এখানে এসেছে সে। কিছু একটা করতে গেলেও টাকা চাই।

একদিন গোপনে ট্রাঙ্কের তলা থেকে হাৎড়ে হাৎড়ে বার করলে আংটটা। অবশ্য, বার করে বিছানার নীচে রেখেও একদিন অপেক্ষা করল। বাসনার সঙ্গে বিবেকের যুদ্ধ—এটা নির্মলের কাছে নতুন! শেষ পর্যন্ত বাসনারই জয় হ'ল যদিচ।

পরের দিন একটা অছিলায় কলকাতায় বেরোল। এখানে এসে পর্যন্ত এই প্রথম বাইরে বেরোল সে।

এ হীরে বেচা মুশ্‌কিল হত যদি ওদের পুরোনো মণিকার চিনতে না পারত ওকে। শুধু যে নিরাপদে বেচা গেল তাই নয়—দামও বেশ পেলে। সাড়ে চার হাজার টাকা নগদ ওকে গুণে দিলে সেই ভাটিয়া জহরৎওয়ালা। কিছু টাকা ব্যাঙ্কে জমা রেখে বাজারে ঢুকে দুখানা ভাল শাড়ী কিনলে আর কিনলে অরুণার জন্যে সুদৃশ্য একজোড়া কঙ্কণ। তারপর বিজয়ের জন্যও ভাল কাপড় একজোড়া কিনে ট্যাক্সি চেপে বাড়ী ফিরল।

অরুণা অবাক্।

'একি করেছ দাদা? এত দামী শাড়ী পরব কবে আর পরে যাবোই বা কোথায়? এই ঘরে এই ভাবে থাকা—তা ত বুঝতেই পারছ!'

'তা হোক্। বেড়াতেও ত যেতে পারিস্ কোথাও। থিয়েটার বায়স্কোপে ত যাওয়া চলবে!'

'হাঁ, কত ত যাচ্ছি। এ কাপড়টা কার?'

'ওটা—মানে তোর কাছে আসে, তোকে দিদি বলে—ঐ পারুলের জন্য এনেছিলাম আর কি!'

অরুণার মুখ গম্ভীর হয়ে যায়, 'ওদের যে বড্ড আত্মসম্মান-জ্ঞান দাদা। ওরা কি নেবে? আমাকে একবার জিজ্ঞাসা করে কিনলে পারতে।'

'তাতে কি হয়েছে। তোর নাম করে দে না।'

'কোন লাভ হবে না দাদা, ওরা এতদিন আমাদের অবস্থা এটুকু জেনেছে, এমন একখানা কাপড় ইস্কুল-মাস্টারী করে বিলোনো ত দূরের কথা, কেনাই যায় না।'

'তুই একটু বুঝিয়ে দে—'

কাপড়খানা হাতে করে অরুণা পারুলের ঘরের দিকে চলে গেল; কিন্তু একটু পরেই ফিরে এল সেটা হাতে করেই। 'হল না দাদা। অতিকষ্টে যদি বা কাকীমাকে রাজী করালুম—পারুল কিছুতেই রাজী হল না। সে বললে, তাহলে জীবনে আর আপনাদের কাছে যাবো না। কী করব?'

মুখটা বিকৃত করে নির্মল বললে, 'রেখে দে তোর কাছেই। আমি কি একটু বুঝিয়ে বলব?'

'দরকার নেই। শুধু শুধু…'

রাত্রে এসে বিজয় অত্যন্ত রাগারাগি করলে। নির্মলকে প্রায় শুনিয়েই বললে, 'অত যদি ওঁর পয়সা হয়ে থাকে ত হোটেলে গিয়ে থাকতে বলোগে। আমাদের এ গরীবের সংসারে বড়মানুষী

দেখাতে আসার দরকার নেই। ও কাপড় আমি জীবনে পরিও নি, পরবও না। তিনটে টিউশনী করে, নোট লিখে, প্রুফ দেখে আমাকে সংসার চালাতে হয় অরুণা, জরিপাড় দেশী কাপড় পরার আমার অবসর নেই।'

এ কথা শোনবার পর হোটেলেই চলে যেত নির্মল যদি না এখানে পারুলের আকর্ষণ এখনো বেঁধে রাখত। আকর্ষণের চেয়েও জেদটাই যেন প্রবল হয়ে উঠেছে এখন। সে নীরবে রাগে ফুলতে লাগল বসে বসে। কিছুতেই যেন বিজয়কে ও হার মানাতে পারে না। ইচ্ছে করে ঐ চোয়াড় লোকটার গালে চড় মেড়ে ভেঙ্গে দেয় তা চিরকালের মত। কিসের দম্ভ ওর এত?

আরও আঘাত লাগল ওর পরের দিন একটা দৃশ্য হঠাৎ নজরে পড়ে যেতে। বিজয় স্নান করে উঠে দাঁড়িয়ে গা মুছছে উঠোনে—অতি সাধারণ ঘটনা অবশ্যই কিন্তু নির্মলের চোখে এই দৃশ্যই অসাধারণ রঙে প্রতিফলিত হ'ল। সে দোরের কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল পারুলের সন্ধানেই—সেখান থেকে দেখলে ওপাশে ওদের ঘরের সামনে রকে দাঁড়িয়ে পারুল একদৃষ্টে চেয়ে আছে বিজয়ের দিকে। চোখে যেন পলক পড়ছে না, সে চোখে যে মুগ্ধ বিস্ময় ফুটে উঠেছে তা ভুল হবার নয়।

ঈর্ষায় যেন জ্বলে যায় নির্মল।

কী আছে বিজয়ের চেহারায় তা বোঝে না। নির্মলের চেয়ে বয়স কম বটে—তবে নেহাৎ ছেলেমানুষ নয়—প্রথম যৌবনের কান্তি আর নেই তার দেহে, এটা ঠিক। রং? নির্মলের রং ঢের বেশী ফরসা। তবে? কিসে সে ভাল? চওড়া চওড়া

হাড়, এককালে বোধ হয় ব্যায়াম করত—বুকের গঠন মন্দ নয়, হাত পা নাড়বার সময় বলিষ্ঠ পেশীগুলোও মধ্যে মধ্যে বেরিয়ে পড়ে। কিন্তু মেদ বলতে যে কিছু নেই। একটু চর্বি বা মাংস না থাকলে ঠিক সুগঠিত দেহ বলা চলে না কিছুতেই। কিসে ও ছুঁড়ি অমন করে তাকায় ? যেন চোখ দিয়ে গিলেই ফেলবে !

ভেতরে ভেতরে ছট্‌ফট্ করে আর মনে মনে উপায় খোঁজে শোধ তোলবার।

এমন হার জীবনে বোধ হয় কোন দিন মানেনি কারুর কাছে। এতদিন অপেক্ষাও করতে হয়নি কারুর জন্যে।

অবশেষে একটা মতলব মাথায় এল। একদিন সকাল ক'রে খাওয়া দাওয়া হয়ে যাবার পর হঠাৎ নির্মল প্রস্তাব করে বসল, 'তুই কখনও চিড়িয়াখানায় যাস্‌নি বলছিলি অরু, চল্ তোকে আজ ঘুরিয়ে আনি।'

'ওমা সে কি! কখন যাবো—কখন আসব, বিকেলে কাজকর্ম নেই?'

'বিজু তো আজ দেরী করে আসবে বলে গেল। কী-একটা ফেয়ার-ওয়েল আছে, ওখানেই খাওয়াদাওয়া আছে—হয়ত সোজা ওখান থেকেই টিউশ্যনিতে চলে যেতে পারে। তাছাড়া আমরা ট্যাক্সিতে যাবো ট্যাক্সিতে আসবো—কতটুকু সময় লাগবে বল?'

দাদার স্নেহ অরুণা এতই কম পেয়েছে জীবনে যে শুধু সেই লোভেই ওর মনটা দুলতে থাকে। তাছাড়া কথাটাও ঠিক, বিজয় যত তাড়াতাড়িই আসুক, ছ'টার আগে আসবে না।

অতএব সে রাজী হয়ে যায়।

নির্মল বুদ্ধিটা খাটিয়েছিল ভালই। আগে একটি কথাও বলেনি। অরুণা যখন কাপড়-চোপড় পরে তৈরী, তখন খুব উদাসীনভাবে

বললে, 'পারুলকে নিবি নাকি? সেই ট্যাক্সি ত একটা পুরো নিতে হচ্ছেই!'

অরুণা সাগ্রহে রাজী হ'ল। পারুলের প্রতি দাদার একটু পক্ষপাত সে ক'দিন ধরেই লক্ষ্য করছিল কিন্তু তাতে দোষ ধরেনি। বরং মনে মনে কৌতুকই অনুভব করছিল। চিরদিনই কি আর দাদা ভবঘুরে বাউণ্ডুলে হয়ে বেড়াবে, যদি কোথাও শেকড় লেগে যায় ত যাক না! বাঙালীর মেয়ে, ভাইকে ঘরবাসী করার স্বপ্ন সে চিরদিনই দেখে। সেখানে বয়স বা অন্য কোনও দিক্ তার নজরে পড়ে না। তাছাড়া অরুণা সব ইতিহাস জানত না, জানত না অমলার মৃত্যুর কারণ—

সে পারুলকে গিয়ে বললে, 'তুই এখনি তৈরী হয়ে নে পারুল!'

'কেন দিদি?'

'চল্ চিড়িয়াখানা দেখে আসি। দাদা নিয়ে যাচ্ছে।'

চিড়িয়াখানা পারুলও দেখেনি, তবু সে নিরুৎসাহ কণ্ঠে বলে, 'থাকগে দিদি, তুমি যাও।'

'চল্ না। আমি ত যাচ্ছি সঙ্গে, দোষ কি?'

লোভ পারুলেরও কম নয়। সে রাজী হয়ে গেল আর একটু পীড়াপীড়িতে।

বেরিয়ে যখন নির্মল ট্যাক্সী করতে যাচ্ছে অরুণা আপত্তি করবার চেষ্টা করলে, 'ট্রামেই চল না দাদা! এখন ত ফাঁকা।

'পাগল নাকি! পৌঁছতে এক ঘণ্টা হয়ে যাবে।'

শুধু যে সে ট্যাক্সীই ডাকলে তাই নয়, পথে একটা দোকান থেকে নতুন থার্মোফ্লাস্ক কিনে নিয়ে একটা চায়ের দোকান থেকে

চা কিনে দিলে। আর কিছু ভাল কেক্। বললে, 'ঘুরতে ঘুরতে বিষম তেষ্টা পেয়ে যাবে, তুই বুঝিস্ না।'

তেষ্টা যত না পাক ঘুরতে ঘুরতে অরুণা ক্লান্ত হয়ে পড়ে, সে বলে, 'আর দরকার নেই দাদা। এবার ফেরো।'

'সে কি! সাপ দেখবেন না দিদি? শুনেছি সাপের ঘরটা খুব ভাল।'

'তুই বরং দাদার সঙ্গে একটু দেখে আয়। আমি এখানে বসি।'

তখন পারুলের নেশা লেগেছে। সে দু-একবার আপত্তি ও অরুণাকে সঙ্গে টানবার চেষ্টা ক'রে সহজেই রাজী হয়ে গেল।

সাপ কুমীর ইত্যাদি দেখা শেষ হলে নির্মল ইচ্ছা করেই অন্য পথে নিয়ে গেলে পারুল সন্দিগ্ধস্বরে বললে, 'কৈ দিদি কোথায়? এ আমরা কোথায় এলুম?'

'তাইত, বোধ হয় উলটো দিকে এসে পড়েছি। যাক গে, ব্যস্ত হয়ো না।'

তারপর এদিকে ওদিকে দেখে পারুলের একটা হাত নিজের দুহাতে নিয়ে বললে, 'পারুল, দু একটা কথা জিজ্ঞাসা করব— ভয় পেয়োনা। শুধু কথা—'

'কি, হাত ছাড়ুন। কী কথা?' পারুল কিন্তু ভয়ই পায়।

'তুমি, তুমি সেদিন কাপড়খানা নিলে না কেন পারুল। আমি কত আশা করে এনেছিলুম।'

'কেন নেব?' সহজ সুরেই পারুল প্রশ্ন করে, 'আপনার ত আমাকে কাপড় দেবার কথা নয়। আমি অনাত্মীয়।'

'আত্মীয়তা কি কেবল রক্তের সম্পর্কেই হয় পারুল? তোমাকে প্রথম দিন থেকে দেখা পর্যন্ত আমি যে আত্মীয়তা অনুভব করছি তার কি কোন কোন মূল্য নেই। সত্যি বিশ্বাস করো, আমি তোমাকে যত ভালবেসেছি এত আর কাউকে কোনদিনও বাসিনি।'

'এসব কথা আমার ভাল লাগে না। দিদি কোথায়? দিদির কাছে নিয়ে চলুন।'

'যাচ্ছি, এক মিনিট! আর আমি তোমার কাছে কিছুই চাই না পারুল, শুধু দয়া করে তুমি আমার কাছে সামান্য কিছু উপহার নাও। তুমি জানো না কত লোককে কত কী দিয়েছি জীবন-ভোর। কত মেয়েকে কত জড়োয়া গহনায় মুড়ে দিয়েছি। কিন্তু তোমাকে দেখে পর্যন্ত মনে হয়েছে যে সেসব বৃথা। যাকে দিলে জীবন সার্থক হতো—সে সব অলঙ্কার ধন্য হ'ত, তাকে এতদিন পরে খুঁজে পেয়েছি—সে তুমি! তুমি দয়া করো পারুল—হীরের গহনা দেবার সামর্থ্য আর নেই—সোনার গহনাই দু'একটা নাও। আমি মিনতি করছি। আমি দিচ্ছি. কেউ জানবেনা, তুমি দিদির নাম করেই নাও।' বলতে বলতে ভাবাবেগে নির্মলের কণ্ঠস্বর গাঢ় হয়ে আসে।

জোর করে হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে পারুল বললে. 'শীগ্‌গির দিদির কাছে নিয়ে চলুন. নইলে আমি চেঁচাবো।'

অগত্যা নির্মলকে সেইদিকেই যেতে হয়।

ওর এই গাঢ় কণ্ঠস্বর এই নিঃস্বার্থ ভালবাসার অভিব্যক্তি কখনও ত ইতিপূর্বে ব্যর্থ হয়নি। এই গরীব অশিক্ষিত মেয়েটার মন কি পাথরের তৈরী! তা ছাড়া শুধু কি অভিনয়? হয়ত

সবটাই অভিনয় নয়। ওর অন্ধ কামনা অভিনয়ের মধ্যেও কোথায় সত্যিকার আবেগের ছোঁয়া দিয়ে দেয়।

বুকের মধ্যে প্রত্যাখ্যানের অপমানটা কাঁটার মত বেঁধে বার বার।

বাড়ী ফিরে সারারাত ভাবলে নির্মল। কী ভাগ্যি মেয়েটা অরুণাকে কিছু বলে দেয়নি। কিন্তু কেন, কেন এমন হল? ওর এ কৌশল ত ইতিপূর্বে সর্বত্র কার্যকরী হয়েছে। তবে?

অবশেষে এক সময় ওর সন্দেহ হয় যে, হয়ত আগে কৌশলের পেছনে ওর যৌবন এবং রূপও ছিল, তাই তা সফল হত। এখন কোনটাই নেই। তার চামড়া কুঁচকে গেছে, মাংস হয়ে এসেছে থসথসে, লোভনীয় কিছুই নেই। বিজয়ের মত কঠিন গঠনটাও যদি থাকত!

মাথা গরম হয়ে ওঠে নির্মলের। তবে কি জীবনে সম্ভোগের পাত্র তার কাছে নিঃশেষ হয়ে গেছে? সংসারের নানা ভোগ্যবস্তু তার সামনে থরে থরে সাজানো থাকবে—অপরে তা উপভোগও করবে, সেই শুধু দীন নিঃস্ব দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকবে সে সবের দিকে।

পরের দিন সকালেই সে মন স্থির করে ফেললে। অরুণাকে ডেকে বললে, 'আমি চললাম অরু।'

'সে কি দাদা? কোথায় চললে?'

'ভগ্নিপতির পরামর্শটাই নিতে চললাম। একটা হোটেলে গিয়ে উঠব মনে করছি।'

'ছি ছি। ও একটা কি বলতে কি বলে ফেলেছে—সেই কথায় কি রাগ করে! তুমিও কি ছেলেমানুষ হলে?'

'তা নয় রে। কতদিন আর তোদের ঘাড়ে এমন করে চেপে বসে থাকি বল। তোদেরও অসুবিধা হচ্ছে দেখতে পাচ্ছি। তাছাড়া কিছু ত একটা করতে হবে। ধর যদি একটা ব্যবসাই শুরু করতে হয়। লোকজন আসবে যাবে—কোথায় তাদের বসাই বল্ ত?'

তবু অরুণা অনেক অনুরোধ করলে অন্ততঃ আর ক'টা দিন থাকার জন্য, বললে, 'তোমার শরীরটাও মোটে ভাল নেই দাদা, অন্ততঃ একটু সেরে যাও।'

'না রে, শরীর ভাল ছিল না সত্যি, কিন্তু এ কদিনে ঢের সেরে গিয়েছি। আর না।'

এক রকম জোর করেই একটা ট্যাক্সী ডেকে নির্মল চলে গেল।

'তোমার ভগ্নিপতির সঙ্গে দেখা করে গেলে না?' শেষ পর্যন্তও অরুণা বাধা তোলে।

'না না। সে হয়ত জোর করত। অথচ কষ্ট তারই বেশি। আমি আবার আসব, ভয় কি? এই ত কলকাতাই।'

প্রথম শ্রেণীর হোটেলে গেল না নির্মল, ওরই মধ্যে ধর্মতলা অঞ্চলের ভাল একটা হোটেলে গিয়ে উঠল। তারপর টেলিফোন-যোগে পূর্ব জীবনের কুকীর্তি-সহচরদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে আর কতক্ষণ লাগে?

ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নিকে বাতাস দিয়ে জাগাতে হবে, দিতে হবে তাতে নূতন ইন্ধন। জীবন উপন্যাসের শেষ পরিচ্ছেদে এত

তাড়াতাড়ি সে উপসংহার টানতে দেবে না। পূর্ণচ্ছেদ পড়বার এখনও ঢের বেশী দেরী।

সম্ভোগ শেষ হতে দেবে না সে। তাহলে জীবন নিয়েই বা লাভ কি? মরে যাওয়াই ত ভাল। ভোগই ত জীবন। সুখ আর স্বাচ্ছন্দ্য! বিলাস আর ব্যসন!

তেজ মহম্মদকে ডেকে বলে, 'খুব অল্প বয়সী চাই এবার তেজ মহম্মদ। একটু বেশি খরচ হয় ত হোক।'

'খুব ভাল মাল আছে সাব। য়্যাংলো-ইণ্ডিয়ান—সতেরো!'

নির্মলের চোখ দুটো জলে ওঠে।

৫

বিলিতী সুরা ও আধা-বিলিতী তরুণী—নেশায় গা এলিয়ে দেয় নির্মল। আগে মদ এত খেতনা সে, কিন্তু এখন যেন প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। নইলে মনকে সে তাজা রাখতে পারে না।

এমিলি আশ্চর্য। এমিলি অদ্ভুত। শুধু যৌবনই তার টাটকা নয়--মনও তাই। উপহারে উপহারে যখন অভিভূত ক'রে দেয় নির্মল তাকে, তখন তার চোখে শুধু যে বিস্ময় ফুটে ওঠে তাই নয়—নির্মলের মনে হয় সে চাহনিতে পূজার ভাবও প্রকাশ পায়! তার সঙ্গে প্রেমও। নির্মল তাকে বুকে টেনে নিয়ে বলে 'তুমি আমাকে ভালবাস, ডার্লিং?'

'কে জানে কাকে কতটা ভালবাসা বলে ডিয়ারেস্ট—এর আগে ত আর কাউকে ভাল বাসিনি। শুধু পয়সার সম্পর্ক ছিল তাদের সঙ্গে। তাও ক' দিনই বা। কিন্তু তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তোমার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হলে আর বাঁচব না।'

তবু সংশয়ের সুর বাজে নির্মলের কণ্ঠে, 'কিন্তু আমার যে ঢের বয়স হয়েছে এমিলি—'

মুখে হাত চাপা দিয়ে এমিলি বলে, 'বাজে কথা বলো না। কে বলেছে তোমার বয়স হয়েছে, বড় জোর ত্রিশ!···

মাত্র ত চার হাজার টাকা। এ ভাবে চললে এক মাসও চলবে না। তারপর ধারে আরও বড়জোর দশ দিন। তারপর? তারপরের কথা পরেই চিন্তা করবে নির্মল। সে এমিলির প্রেমে ডুবে যায়।

তবে অবশ্য অত দিনও লাগে না। তার আগেই নেশা ছুটে গেল একদিন। অতর্কিত ও অপ্রত্যাশিত ভাবে।

একদিন সন্ধ্যায়ই ঘুমিয়ে পড়েছিল, অচৈতন্য হয়েছিল বলাই উচিত। মাত্রাটা একটু বেশি হয়েছিল বিকেলের দিকে, তারই জের। কিন্তু যেমন হঠাৎ ঘুমিয়ে ছিল তেমনি হঠাৎই ঘুমটা ভেঙ্গে গেল। দেখলে ঘরে এমিলি নেই। এমিলি ওরই কাছে ছিল ঘুমোবার সময়—ওর কাছেই থাকবার কথা। কোথায় গেল? ছেলেমানুষ বোধ হয় ছাদে উঠেছে—কি বারান্দায় বসে আছে। পা টিপে টিপে গিয়ে পেছন থেকে ওকে চমকে দেবে এই ইচ্ছায় নির্মল নিঃশব্দে উঠে দাঁড়াল। ঘরের সঙ্কীর্ণ বারান্দা—

গাছপালার টবে সাজানো। তাতে পাশাপাশি দুটি চেয়ারও থাকে। আলো নেই, রাস্তার আলোর আভা এসে পাতাবাহারের ছায়ার সঙ্গে জড়াজড়ি করে একটা আলো-আঁধারির সৃষ্টি করেছে, তাতে কাছে থেকে দেখার অসুবিধা হয় না। বিশেষ উদ্দেশ্যেই এখানে এই আবছায়ার সৃষ্টি।

সেখানে এমিলি ছিল ঠিকই. চমকেও উঠল। তবে সে চমকটা ঠিক আনন্দদায়ক চমক বলা চলে না। হোটেলের একটি প্রিয়দর্শন তরুণ মুসলমান বেয়ারার বাহুবন্ধনের মধ্যে থেকে সে যখন উঠে দাঁড়াল তখন তার মুখ একেবারে বিবর্ণ হয়ে গেছে।

তার পরের ইতিহাস যেমন বিশ্রী, তেমনি পীড়াদায়ক।

চেঁচামেচি, গোলমাল। ক্ষোভ আত্মগ্লানি ও চরম হতাশায় কিছুক্ষণের জন্য সত্যিই নির্মল পাগল হয়ে গিয়েছিল বোধ হয়, নইলে এমিলিকে লাথি মারবে কেন—অত চেঁচামেচিই বা করবে কেন? প্রকৃতিস্থ থাকলে নিঃশব্দেই পরাজয় মেনে নিত, আঘাতকে অপমানিত হতে দিয়ে দুঃসহ করে তুলত না কিছুতেই—

হোটেলের ম্যানেজার শাসালেন। এমিলির মা এসে পুলিশ ডেকে আনলে। পাঁচশ' টাকা সেই রাত্রেই গুণে দিয়ে অব্যাহতি পেতে হল তাকে।

কিন্তু আঘাত বোধ হয় মাথায় গিয়ে বেজেছিল—শেষ রাত্রি নাগাদ প্রবল জ্বরে শয্যাগত ও অচৈতন্য হয়ে পড়ল নির্মল। তারপরই শুরু হল ভুল বকা।

ভাগ্যিস হোটেলের খাতায় বাড়ীর ঠিকানাটা দিয়েছিল—তাই হোটেল-ওয়ালা খবরটা দিতে পারলে তবু।

অরুণা ও বিজয় এসে বাড়ীতে নিয়ে গেল যখন তখন সে টেরও পেলেনা। সম্পূর্ণ বিকারের ঘোরে কী সব বকে যাচ্ছে। তার মধ্যে শুধু তিনটে নাম বারবার আসছিল—অমলা, পারুল, এমিলি—

কঠিন রোগ, সারতে দেরি লাগবে। বিজয়ের অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠছে দেখে অরুণাই প্রস্তাব করলে, 'না হয় হাসপাতালে দাও। তুমি আর কত করবে?'

বিজয় হাসলে একটু, 'হাসপাতালে দেওয়া আজকাল অত সহজ নয় অরু, তাছাড়া উনি সুস্থ থাকলে আমি হয়তো ওঁকে বাড়ী থেকে একদিন বার করে দিতেও পারতুম, কিন্তু এখন এই অবস্থায়—সে আমি পারব না, মরে গেলেও না। তোমার ভাই সেটা ভুলে যেও না'

চিকিৎসার কোন ত্রুটি হয়নি। অরুণার সামান্য যা দু একটি অলঙ্কার ছিল—সবই বাঁধা পড়েছে মায় নির্মলের দেওয়া কঙ্কণ জোড়াও কিন্তু তবু বিজয় ছোট ডাক্তার ডাকেনি। ব্যাঙ্কের খাতায় নির্মলেরও শ' তিনেক টাকা পড়ে আছে বটে তবে সে তুলবে কে? বাক্সয় বালিশের তলায় যা ছিল তা যে নেই—বলাই বাহুল্য। হোটেলের চাকররা বখশীষটা অগ্রিমই নিয়ে নিয়েছে।

আর যেটার কোন ত্রুটি হয়নি সেটা হচ্ছে শুশ্রূষার।

অরুণা ত ছিলই—বিজয়কে সে সাধ্যমত রাত জাগতে দেয়নি বলেছে, 'তুমি পড়লে যে সমস্ত যাবে। ডান হাতের ব্যাপার বন্ধ। তোমার শরীরটা অন্তত সুস্থ রাখো, খাটবে কি করে? কিন্তু সারা দিনটা ছিল অরুণার ছুটি, সে সময়টার ভার সম্পূর্ণ

গ্রহণ করেছিল পারুল। অরুণাকে বলত, 'তুমি সারারাত জাগছ, তার ওপরে সংসারের খাটুনী, দুপুরটা একটু না ঘুমোলে বাঁচবে কি করে দিদি!'

'কিন্তু তুই বোন এমন করে একটা অনাত্মীয় পুরুষ মানুষকে সারাদিন সেবা করবি—কেউ কিছু বলবে না ত?' প্রথম দিন বলেছিল অরুণা।

মাথা নত করে পারুল জবাব দিয়েছিল, 'পীড়িত আতুরের আবার জাত কি দিদি, ও ত শিশুর সমান। তাছাড়া বলবার মধ্যে যার বলাকে আমি ভয় করি সে বাবা। কিন্তু তিনি কিছু বলবেন না। এসব ব্যাপারে তিনি খুব উদার। তাঁর কাছে সেবার তুল্য কোন পূজা উপাসনা নেই!'

প্রথম যেদিন আবছা জ্ঞান হল নির্মলের সেদিন তার বিশ্বাসই হয় নি। নিজের চোখের ওপরই যেন ভরসা হারিয়েছিল; মনে করলে এখনও বুঝি তার বিকার রয়েছে।

কিন্তু তারও দু-একদিন পরে যখন আর সংশয়ের অবকাশ রইল না, তখন তার মনের ওপর দিয়ে যে বিস্ময়ের একটা প্রবল ঢেউ বয়ে গেল তাই নয়, আনন্দের জোয়ারে তার সমস্ত ভাবনা কূলে কূলে ভরে টলমল করতে লাগল।

'পারুল, তুমি আমার কাছে রয়েছ, তুমি?'

'হ্যাঁ—কেন আমাকে চিনতে পারছেন না?'

'পারছি পারুল, কিন্তু যেন বিশ্বাস হতে চাইছে না?'

তারপর একটু চুপ করে থেকে বললে, 'তুমি আমার সেবা করছ কেন পারুল? বলোনা—'

সহজ ভাবেই পারুল জবাব দিলে, 'আপনার যে অসুখ করেছে।'

'কিন্তু তুমি ?'

'দিদি একা মানুষ, কত পারবে বলুন। সারারাত ত জাগেন। জামাই বাবুরও কোন অবকাশ নেই!'

'ও, তাই!' চুপ করে থাকে নির্মল খানিকক্ষণ, বোধ হয়, কোথায়ও একটা ধাক্কা পায় মনে মনে।

অরুণা এসে কাছে বসতে প্রশ্ন করলে, 'তোদের কাছে এলুম কি করে রে অরু ?'

'হোটেলের খাতায় এইখানকার ঠিকানা দিয়েছিলে, ওরাই খবর দিলে।'

'তোদের কখনও কোন উপকারে এলুম নারে—শুধু অনিষ্টই করে গেলুম...তোর চুড়ি ক-গাছা কি হল রে ?'

অরুণা মাথা হেঁট করে বললে, 'ওসব কথা এখন থাক দাদা। অত কথা কওয়া বারণ।'

'বুঝেছি। আমার অসুখেই গেছে। আমার ব্যাঙ্কে কি কিছুই নেই রে ? খাতাটা দেখেছিস ?'

'সে আমি জানিনা। এখন তুমি চুপ করো ত।'

দিন চারেক পরে সন্ধ্যায় যখন অরুণা রান্না ঘরে ব্যস্ত, পারুল নির্মলের হরলিকস নিয়ে ঘরে ঢুকে দেখলে দু-তিনটে বালিশে ঠেস দিয়ে উঠে বসেছে সে। একটু যেন উৎসুক ভাবেই চেয়ে আছে দোরের দিকে। ওকে দেখে কতকটা অভিমান-ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললে, 'তুমি কোথায় গিয়েছিলে পারুল, আমি কতক্ষণ ধরে ঠায় দরজার দিকে চেয়ে আছি।'

ওর চোখের খুশি পারুলের চোখেও ধরা পড়ে। সে লাল হয়ে উঠে বলে, 'বা রে! আমার বুঝি আর সংসারের কাজ নেই। আপনি ত এখন অনেকটা ভাল, তাই একটু আধটু মার কাজে সাহায্য করে আসি। আটাটা মেখে রেখে এলুম। নিন্ এটা খান ত।'

মুখের কাছে এগিয়ে ধরে কাপটা। খাওয়া হয়ে গেলে সযত্নে আঁচল দিয়ে মুখ মুছিয়ে নেয়।

'একটু এখানে বসো পারুল চুপ করে।'

পারুল বিছানার পাশে টুলটাতে বসল স্থির হয়ে। কিছুক্ষণ ওর মুখের দিকে চেয়ে থেকে নির্ম্মল বললে, 'এত তাড়াতাড়ি ভাল না হয়ে যদি আরও কিছুদিন ভুগতুম ত ভাল হত। তোমার হাতের সেবা দুদিন বেশি পাওয়া যেত। আর খানিকটা ভাল হলে ত আর তুমি কাছেই আসবে না।'

'না এলেই বা ক্ষতি কি। এমিলির দল ত আছে আপনার!' কথাটা শুনেছিল বিজয়ের মুখেই। হোটেল থেকে বিজয় সংগ্রহ করেছিল খবরটা। কিন্তু বলে ফেলেই বিষম লজ্জিত হয়ে পড়ল পারুল। আড়ে নির্মলের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলে তার মুখখানাও ফ্যাকাশে হয়ে গেছে।

কিন্তু প্রসঙ্গটা বন্ধও করলে না। যে কথাগুলো অনেক দিন ধরে মনে ছিল এই সুযোগে বলেই ফেললে।

ওর মুখের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে বললে, 'আপনি আমার একটা কথা রাখবেন।'

'তোমার কথা? নিশ্চই রাখব পারুল।' নূতন উৎসাহে সোজা হয়ে বসে নির্মল।

'এমন করে আর জীবনটাকে নষ্ট করবেন না। এখন বয়স হচ্চে—এসব আর সহ্য হবে না। যা হয় একটা কাজকর্ম যোগাড় ক'রে নিয়ে একটা বিয়ে-থা করুন, ঘরবাসী হোন।'

'বিয়ে-থা? তুমি কি ক্ষেপেছ পারুল। এই বয়সে আবার বিয়ে! আমার মত ভবঘুরেকে মেয়ে দেবেই বা কে?' সে আবার বালিসে এলিয়ে পড়ে।

'ভবঘুরে থাকলে কেউ হয়ত দেবে না। কিন্তু থাকবেনই বা কেন? রোজগার-পাতি করুন—'

'কি দিয়ে করব বল। ব্যবসার মুলধন কোথায় পাবো?'

'ব্যবসা আপনার দ্বারা হবে না। এতদিন ত দেখলেন। একটা চাকরী-বাকরী দেখে নিন।' চরম সাহসে ভর ক'রে বলে ফেলে পারুল। ধৃষ্টতা প্রকাশ পাচ্ছে হয়ত—এ আশঙ্কা সত্বেও না বলে পারে না।

'তাই বা কে দেবে পারুল আমাকে? দিলেও সামান্য চাকরী—তাতে কি আর বিয়ে করা চলে?'

'খুঁজলে আপনি চাকরী খুব পাবেন। বি-এ ত পাস করেছেন দিদির মুখে শুনলুম। আর চাকরী সামান্য হলেও বাঁধা আয়, খরচ কম করবেন। দুটো প্রাণীর কীই বা লাগে?'

'দারিদ্র্যের মধ্যে কি সুখ কিছু সত্যিই আছে পারুল?'

'সুখ কি আপনি যে পথে ঘুরেছেন তাতেই ছিল? এতে সুখ না থাক্ শান্তি আছে। মনের সুখের কি কোন দাম নেই?' এ কদিনে অসুখের মধ্যে অরুণা আর বিজয়ের কথোপকথন থেকে অনেক তথ্যই সংগ্রহ করেছে পারুল—নিঃশব্দে।

অনেকক্ষণ চুপ করে রইল নির্মল। পারুলই আবার প্রশ্ন করল, 'কি হল? কি ঠিক করলেন? আমার কথাটা শুনবেন?'

'তোমার কথা আমাকে শুনতেই হবে পারুল। আর চাকরী খোঁজা ছাড়া আমার ত কোন উপায় রইল না। খাবোই বা কি। কিন্তু যদি চাকরী একটা খুঁজে নিতে পারি, মেয়ে কি জুটবে পারুল?'

'ওমা, মেয়ের আবার অভাব!'

'তুমি আমাকে বিয়ে করবে? না না, লজ্জা পেওনা। সত্যি ক'রে বলো ত?'

লজ্জায় আগুনের মত লাল হয়ে পারুল উঠে দাঁড়াল। অর্ধস্ফুট জড়িত কণ্ঠে বললে, 'চাকরী-বাকরী করলে বাবা হয়ত রাজী হবেন।'

তারপরই যেন একরকম ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

অনেকক্ষণ পর্যন্ত কানকে যেন বিশ্বাস করতে পারলে না নির্মল। ব্রীড়াবনতমুখী কিশোরীর সুগভীর লজ্জার সেই সুমধুর ছবিটি ওর মুগ্ধ দৃষ্টিতে যেন লেগে রইল কিছুকালের জন্য। অপস্যমান ওর অপরূপ মূর্তির সেই গতিপথের দিকে একদৃষ্টে খানিকটা চেয়ে থেকে প্রাণপণে চেঁচিয়ে উঠল, 'অরু, ওরে অরু, মুখপুড়ী গেলি কোথায়!'

অরুণা ছুটে এসে বলে, 'হাঁ হাঁ করো কি, চেঁচাচ্ছ কেন? আবার অসুখে পড়বে? তোমার মতলবটা কি?'

'কিছুক্ষণ আগে সেই মতলবই ছিল বটে কিন্তু এখন আর নেই। তোদের এখানে এসে আসল সুখটা কি চিনেছি, এখন আমার সুস্থ থাকবারই ইচ্ছা। প্রাণপণে সেরে উঠব এবার

খবি। কাল রবিবার, পরশু আমাকে সকাল ক'রে খাইয়ে দিবি, আমি চাকরী খুঁজতে বেরোব।'

অরুণা ওর দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে দেখে হেসে উঠে নির্মল বললে, 'ভাবছিস্ আবার ভুল বকচি? না না, এবার চাকরী-বাকরীই করব, নইলে খাবো কি? তাছাড়া—ভাবছি তোদের মত এবার ঘর বাঁধব। উপকরণ সামান্য, অভাব আরও কম—এমনি একটি সুখের নীড়। বিয়ে করব রে, বিয়ে। ভাল চাকরী না পাই বিজু একটা মাষ্টারী খুঁজে দিতে পারবে না? সে হতভাগাটা গেল কোথায়? তাকে বুঝিয়ে বলতে হবে!'

আনন্দে যেন ছেলেমানুষের মত চঞ্চল হয়ে ওঠে সে। *

শেষ

* একটি মার্কিণ নাটকের মূল বক্তব্যের প্রভাব এই কাহিনীতে পড়েছে খানিকটা।